



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রসংখ্যা

বর্ষ ১১ ॥ ৪৪-৪৫ যুগ্মসংখ্যা
২৫ বৈশাখ ১৩৮৫ ॥ ৯ মে ১৯৭৮

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা ৭·৫০ টাকা, ষান্মাসিক ৩·৭৫ টাকা।

প্রতি সংখ্যার দাম ১৫ পয়সা
এই সংখ্যার দাম ৫০ পয়সা

মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জী রোড
কলিকাতা-১

ক্রস্‌ড্ চেক (কেবল কলকাতার ব্যাংকের উপর) এবং পোস্টাল অর্ডারও তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তার নামে পাঠানো যেতে পারে।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প খাম পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

নিবেদন

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে বুদ্ধিজীবী মহল থেকে আশাতীত সাড়া পাওয়া যাওয়ায় আমরা গর্ব অনুভব করছি।

এই পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেও কিন্তু সবকটি নিবন্ধ বর্তমান সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

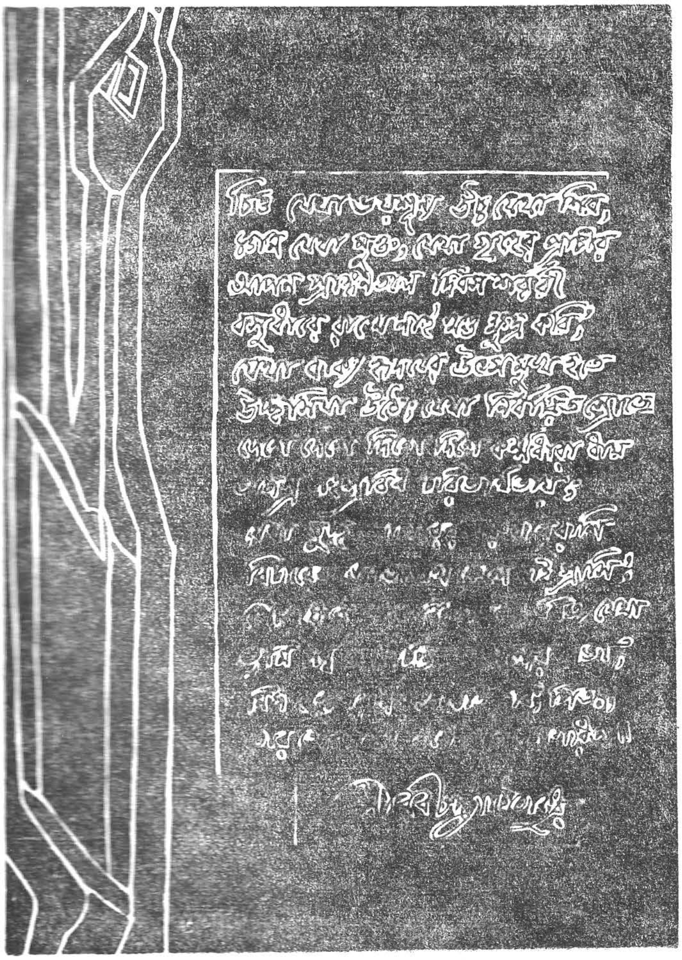
'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাটি রবীন্দ্রচর্চায় নিবেদিত হয়ে আরও ছয়টি মূল্যবান নিবন্ধসহ বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে। ১৯ মে ১৯৭৮ তারিখের ঐ সংখ্যায় সর্বশ্রী ভূদেব চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ও হীরেন ভট্টাচার্য রচিত নিবন্ধগুলি মুদ্রিত হবে। সংখ্যাটির দাম হবে ৩০ পয়সা।

প্রধান সম্পাদক
সুনীলকুমার সেনগুপ্ত আই. এ. এস

পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রসংখ্যা • ২৫ বৈশাখ ১৩৮৫





...নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহু-কোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য উগ্র হয়ে উঠল।

→

......মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—দেখে-ছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।...সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে-সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্ণমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানজনক নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না।......

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দলপাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।...... সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে।...পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।......

এমনসময় দেখা গেল সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চ-নতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম-আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ—আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভি-যানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকার-হীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

—'সভ্যতার সংকট' থেকে

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ

প্রবোধচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষের দুই প্রধান সমস্যা, ভাষাসমস্যা ও হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা। অখণ্ড বাংলাদেশের (তথা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের) প্রধান সমস্যা একটাই, সেটি আমাদের দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের সমতা বা সমন্বয়-বিধানের সমস্যা। কি পূর্ব কি পশ্চিম, দুই বাংলার এটাই সবচেয়ে জটিল সমস্যা। এই সমস্যার হিমশৈলে আহত হয়ে আমাদের জাতীয় তরণী সহসা দ্বিখণ্ডিত হয়ে আজ লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলেছে নির্মম ইতিহাসের খরস্রোতে। এই অসহায় অবস্থাটা যে-কোনো চিন্তাশীল দেশপ্রেমিককে সবচেয়ে বেশি পীড়িত করে। বলা বাহুল্য, কোনো প্রকার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারাই এর প্রতিকার সম্ভব নয়। কারণ এটা আসলে সামাজিক সমস্যা এবং এর শিকড় নিহিত রয়েছে দীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে। এর ঐতিহাসিক স্বরূপ নিরূপণ না করে শুধু তুকতাক বা হাতুড়ে চিকিৎসার দ্বারা এই ব্যাধির প্রতিকারের আশা দুরাশা মাত্র। আজ পর্যন্ত কেউ এই সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ ও তার মূল কারণ নিরূপণে এবং তার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে প্রয়াসী হয়েছেন বলে জানি না। অথচ আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এই কাজেই ব্রতী হওয়া উচিত ছিল সর্বাগ্রে। তার মূল কারণ এ বিষয়ে আমাদের প্রায় সর্বজনীন ঔদাসীন্য, অথবা জ্ঞাতসারেই হক বা অজ্ঞাতসারেই হক, উভয় পক্ষের মনের সুগভীর ও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দেশে পুরোপুরি নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মনন-পরায়ণতার বড়ই অভাব। বলা যায় এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। তিনি কখনও এ বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনায় প্রয়াসী হয় নি। বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষে তিনি এ বিষয়ে যেসব মত প্রকাশ করেছেন তার থেকেই তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নানা রচনায় এ বিষয়ে তাঁর যেসব মন্তব্য বিকীর্ণ হয়ে আছে সেগুলিকে একত্র সংকলন করে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে এ বিষয়েও তাঁর মনোভাবের ক্রমপরিণতি আছে এবং সে পরিণতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার দিকে। শুধু তাই নয়, তাঁর চেষ্টা এই সমস্যার ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল সন্ধানের দিকে। রবীন্দ্রভাবনার এই দিক্‌টার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে হলে একটি নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করতে হয় এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তার ঐতিহাসিক পরিবেশের একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া। যে সামাজিক ও মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় না পেলে তাঁর পরিণত মনোভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরকম ছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানা যায় তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে (১৩৪০ শ্রাবণ) থেকে। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি এই—"সে (মুসলমান) যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল। কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের।... মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে, কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিংবা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে।" অর্থাৎ দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করলেও সামাজিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের প্রতি উদাসীন ও প্রায় নিঃসম্পর্ক হয়েই রইল। "দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয়, কিন্তু তা সামান্য।" বহু শতাব্দী কাটল এভাবেই। অবশেষে ইংরেজ রাজত্বকালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু সে পরিবর্তনটাও সুফলপ্রসূ হল না।

মুসলমানরা দীর্ঘকালের রাজক্ষমতা হারিয়ে ইংরেজ জাতি, ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ হয়ে তাঁদের সনাতন ধর্মসংস্কৃতিকেই আঁকড়ে রইল। আর হিন্দুরা দীর্ঘকালের মুসলমান রাজত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিশৃঙ্খলাকে আশীর্বাদ বলেই গ্রহণ করল এবং শাস্ত্রীয় বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বরণ করে নিতে দেরি করল না। ফলে মুসলমানরা মক্তব-মাদ্রাসার চৌহদ্দির মধ্যেই আটকা পড়ে রইল। আর হিন্দুরা স্কুল-কলেজী শিক্ষার সহায়তায় প্রভাব-প্রতিপত্তিতে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল। এভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবধান ও অসমতা বেড়ে গেল। এই ব্যবধান ও অসমতা স্বভাবতই তাদের মানসিকতাতেও প্রতিফলিত হল। দুষ্মন ইংরেজকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নেবার ফলে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের স্বাভাবিক বিরূপতা ক্রমে দৃঢ়তর হতে লাগল। আর হিন্দুরাও মুসলমানকে অবাঞ্ছিত বিধর্মী ও বিদেশী বলে গণ্য করতে লাগল। আর হিন্দু কলেজ, হিন্দু হস্টেল, হিন্দুমেলা প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানকে 'হিন্দু' নামে চিহ্নিত করে কার্যত মুসলমানকে বহিষ্কৃত করার ফলও ভাল হতে পারে না। মুসলমানের প্রতি এই অবজ্ঞার মনোভাব তখনকার হিন্দুরচিত সাহিত্যেও কিছু প্রতিফলিত হয়েছিল। যেমন, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ('কানপুরের যুদ্ধজয়')—

কেবলি মর্জি তেড়া, কাজে ভেড়া মাথা যত।
নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মত॥

এখানে যে অতিমাত্র উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা কিছু পরিমাণে বিপক্ষের প্রতি যুদ্ধকালীন বিদ্বেষের ফল। কিন্তু পুরোপুরি তা নয়। স্বাভাবিক বিরূপতার সঙ্গে যুদ্ধকালীন বিদ্বেষ মিলে এই উগ্রতার প্রকাশ ঘটেছে।

কানপুরের যুদ্ধের প্রায় দশ বছর পরে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭)। এই মেলা চলে অন্তত চোদ্দ বছর (১৮৮০ পর্যন্ত)। এই মেলা বাঙালির জাতীয় জীবনে একটা বড় রকমের আলোড়ন আনে, বস্তুত বাঙালির ইতিহাসের গতিকে মোড় ফিরিয়ে দেয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। অথচ এই মেলায় মুসলমানের কোনো স্থান ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম মেলার নবম অধিবেশন (১৮৭৫)। এই অধিবেশনে ওস্তাদ মৌলা বক্সের সংগীত সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। তার কারণ সম্ভবত এই যে, মৌলা বক্স ছিলেন বরদা রাজ্যের অধিবাসী এবং হিন্দু সংগীতের অনুরাগী। তাই হিন্দুমেলায় যোগ দিতে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল না।

হিন্দুমেলার নামান্তর ছিল 'জাতীয় মেলা' অর্থাৎ হিন্দুর জাতীয় মেলা বা হিন্দুজাতির মেলা। বার্ষিক হিন্দুমেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে তার সঙ্গে যুক্ত ছিল তার একটি মাসিক কর্মসমিতি, নাম 'জাতীয় সভা' (National Society)। "হিন্দুজাতির সর্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্ধন এবং...উন্নতিসাধন করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য। অন্যূন এক মুদ্রা বার্ষিক দান করিলে হিন্দুনামধারী মাত্রেই এই সভার সভ্যতাপদের অধিকারী হইবেন।" আর হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল—'সর্ব-সাম্প্রদায়িক হিন্দু'র স্বজাতীয় সর্বপ্রকার উন্নতিপক্ষে উৎসাহদান ও উপায় অবলম্বন। 'সর্ব-সাম্প্রদায়িক' হিন্দু বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার অন্যতম প্রধান উদ্‌যোক্তা মনোমোহন বসুর একটি উক্তি থেকে। তাঁর মতে হিন্দুমেলা হবে এমন একটি মিলনস্থল যেখানে 'বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক'-নির্বিশেষে ভারতবর্ষস্থ সর্ব শ্রেণীর হিন্দু ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত মতভেদ ভুলে সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তা ছাড়া 'নেপালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী' প্রভৃতি সর্বভারতের হিন্দুরাই এখানে মিলিত হবেন, তাও ছিল হিন্দুমেলার উদ্‌যোক্তাদের অভিপ্রায়। অর্থাৎ হিন্দুমেলা ও তার অনুষঙ্গ জাতীয় সভায় মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি অহিন্দুর কোনো স্থান ছিল না। সুখের বিষয় তখনকার দিনেও অনেকেই ভারতবর্ষের জাতীয়তা সম্বন্ধে এ-রকম সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁদের মতে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সব ভারতীয়কে নিয়েই ভারতবর্ষের জাতীয়তা, শুধু বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুকে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত তাকে কিছুতেই 'জাতীয়' বলা যায় না। হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার দুই প্রধান নেতা নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বসু, এঁরা উভয়েই এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেন। মনোমাহন বসু তাঁর সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় বলেন, হিন্দুরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্রকে 'জাতীয়' বলে অভিহিত করায় কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। ন্যাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র বলেন (১৮৭২ ডিসেম্বর ৪)—"We do not understand why our correspondent takes exception to the *Hindoos who certainly form a nation by themselves*, and as such a society established by them can very be called a National Society." সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, হিন্দুমেলার অনুষঙ্গ 'জাতীয় সভা'-কেই উত্তরকালীন 'হিন্দুমহাসভা'র আদিরূপ বলে বর্ণনা করা অন্যায় নয়, আর মহম্মদ আলী জিন্নার বহুনিন্দিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবীজ রোপণ করেছিলেন হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার প্রতিষ্ঠাতারাই। এই দুই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রাণপুরুষ রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণ প্রবন্ধটিও পড়েছিলেন এই জাতীয় সভারই এক অধিবেশনে (১৮৭২ সেপটেম্বর ১৫)। তা ছাড়া তিনিই পরবর্তী কালে (১৮৮৬) ইংরেজি ও বাংলায় লিখিত 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে এক পুস্তকে 'মহা-হিন্দুসমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার বিবরণ দেন। এই মহা-হিন্দুসমিতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনীতি ক্ষেত্রেও হিন্দুজাতির অধিকার রক্ষা ও উন্নতিসাধন। এখানে সেই হিন্দুসভারই পূর্বাভাস সূচিত হল। ১৮৮১ সালে রাজনারায়ণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে বলেন—"মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড

কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেরূপ হিন্দুসমাজই আমাদিগের কার্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ...যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দুজাতিকে উত্তেজিত করিব। যাহাতে ...রাজপুতানার বীরকুলচূড়ামণি প্রতাপ সিংহের সময় পর্যন্ত ভারতের মহিমার প্রধান কথা অবলম্বন করিয়া হিন্দুজাতি উন্নতির মঞ্চে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় আমরা প্রাণপণে এরূপ চেষ্টা করিব। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বন্ধ হয়, যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি হিন্দুবর্গ এক হৃদয় হয়, যাহাতে তাহাদের সকলপ্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্মসংগত বৈধ সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।" এই হল তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তার মূল কথা।

সেকালে ঠাকুর পরিবারেও এই হিন্দুজাতীয়তার হাওয়া প্রবল ছিল। হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা স্থাপনের মূলে ছিল ঠাকুর পরিবারেরই সহায়তা ও সমর্থন। হিন্দুমেলা তথা জাতীয় সভার প্রথম দুই সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের বিভিন্ন উক্তিতে বারবারই 'হিন্দুজাতি' কথাটা উচ্চারিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত-সন্তান' ইত্যাদি বিখ্যাত জাতীয় সংগীতটি তো আসলে হিন্দু ভারতেরই জয়গান। তাতে ভীষ্ম-দ্রোণ থেকে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত বীরদের কীর্তি মহিমা উদ্‌গীত হয়েছে। তার পরেই 'যবনের' আবির্ভাবের ফলে 'অধীনতা আনিল রজনী'। অর্থাৎ বৈদেশিক বিজেতা মুসলমানের হাতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও কীর্তিগৌরব বিনষ্ট হয়। সেই স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরিয়ে আনাই যেসব প্রতিষ্ঠানের (হিন্দুমেলা, জাতীয় সভা তথা রাজনারায়ণের সঞ্জীবনী সভা) লক্ষ্য, স্বভাবতই বিজেতৃজাতীয় মুসলমানকে সেসব প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা চলে না।

কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের মনোজীবন গড়ে উঠেছিল এই হিন্দুজাতীয়তাবোধের পরিমণ্ডলেই। তাঁর প্রথম জীবনের অনেকগুলি কবিতাতেই তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে শুধু দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়াই যথেষ্ট। 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতায় (১৮৭৫) দেখি রাজা যুধিষ্ঠির আর্য-সিংহাসনে বসে স্বাধীন ভারতে যে স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই মোহময় কল্পনায় বালক রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত বিভোর হয়ে আছে। আবার দেখি এই ভারতভূমিতে বিগত কালের মহিমামণ্ডিত রামরাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্যও কবিহৃদয় ব্যাকুল হয়ে আছে।—

> শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
> রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার
> শাসিতেন হায়, এ ভারতভূমি,—
> আর কি সে দিন আসিবে ফিরে!

সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও প্রাচীন হিন্দুভারতের শেষ বীর হিসাবে পৃথ্বীরাজের নাম উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তবে এ কবিতায় বালক রবীন্দ্রনাথ তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা দুর্গাবতীর নাম উল্লেখ করে হিন্দুভারতের গৌরবযুগকে আর-একটু প্রসারিত করেছেন। হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতাটিতে (১৮৭৭) আছে—

> এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরী,
> স্বর্গরসাতল জয়নাদে ভরি
> রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
> তখনো একত্রে ভারত জাগে নি ইত্যাদি।

এর থেকেও বোঝা যায় তখনকার দিনে হিন্দুজাতীয়তাবাদীদের মতে মুসলমান বিজেতাদের আক্রমণেই ভারতীয় স্বাধীনতা ও গৌরবযুগের অবসান ঘটে। সেকালে অনেক হিন্দুর মনই প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের নানা প্রকার কল্পিত গৌরবস্মৃতিতে পরিপূর্ণ থাকত। 'আর্যতেজ গর্বভরে পৃথ্বী থরথর', রবীন্দ্রনাথের এই উত্তরকালীন উক্তিটি প্রধানত এইকালের পক্ষে প্রযোজ্য।

পূর্বে বলেছি 'জাতীয় সভা' প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালেই কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, শুধু হিন্দুকে নিয়ে গঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানকে 'জাতীয়' বিশেষণে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। এই মনোভাবের লোক তখনকার দিনে বিরল ছিল বলেই মনে হয়। তবু অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এমন দু-এক জনের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। আলোচ্য বিষয়টাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, পৃথ্বীরাজের পরবর্তী বহু শতাব্দীব্যাপী মুসলমান-রাজত্বকালকে ভারতবর্ষের পরাধীনতার কাল বলে চিহ্নিত করা সংগত কিনা? দুই, আধুনিক কালে মুসলমানকে ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ বা অংশভাগ বলে গণ্য করা যায় কিনা? এই দুই বিষয়ে প্রথমেই বহুনিন্দিত বা বহুবিতর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের দেশে খুব কমই জন্মেছেন। ইতিহাসপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত পার্থক্যটা কখনও প্রাধান্য পায় নি। প্রাধান্য পেয়েছে সামগ্রিকভাবে দেশের জনকল্যাণের প্রশ্নটা। তাই তিনি তাঁর 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১২৮০ ভাদ্র) বলেছেন—যে রাজ্য পরজাতি পীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন। অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে।...পক্ষান্তরে, কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, নর্মানদিগের সময়ে ইংলন্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দীনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।" দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভারতবর্ষের মুসলমান-রাজত্বকালকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরাধীনতার কাল বলা সংগত নয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে শুধু বাংলা দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত কি, তাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ) তাঁর একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ওই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্ন-জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না।... পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে,

পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায়। পাঠান শাসন-কালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়ে স্মার্ততিলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণবগোস্বামীদিগের অপূর্ব গ্রন্থাবলী;—চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খিষ্ট শতাব্দীর মধ্যেই ইহাদের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।" স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশের এই দুই শতাব্দীব্যাপী মুসলমান-রাজত্বকালকে বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীনতার যুগ বলে চিহ্নিত করেন নি। বরং স্বাধীনতার যুগ তথা পরম গৌরবের যুগ বলেই স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও স্পষ্ট করেই বলেছেন—"অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবরকে আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠানই আমাদের মিত্র।...বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগলকর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্তির চিহ্ন পাওয়া যায়।...কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোনো কীর্তি কেহ দেখিয়াছে?" আধুনিক কালের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি উক্তি পুরোপুরি সত্য বলে গণ্য না হতে পারে, কিন্তু তাঁর উদার মনোভঙ্গি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সে মনোভঙ্গিকে আর যাই বলা যাক, সংকীর্ণ হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার বা হিন্দু-জাতীয়তার মনোভঙ্গি বলা যায় না।

১৮৮০ সালে লেখা 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধেও (বঙ্গদর্শন ১২৮৭ অগ্রহায়ণ) বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ কথাই লিখলেন—"মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল।" দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতা সম্বন্ধে হিন্দু-জাতীয়তাবাদীর মনোভাব যে বঙ্কিমচন্দ্র পোষণ করতেন না, তাতে লেশমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। পাঠান ও মুসলমান, মোগলও তাই। কিন্তু বঙ্কিমের মতে পাঠানদের আমলে বাংলা স্বাধীন ছিল, মোগলদের আমলে পরাধীন। আবার আকবর-প্রমুখ মোগলের শাসনে ভারতবর্ষ ছিল স্বাধীন, কিন্তু তাঁদের শাসনকালেই বাংলাদেশ ছিল পরাধীন, হৃতসর্বস্ব। অর্থাৎ বঙ্কিমের মতে দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিচারে শাসকের জাতি বা ধর্ম বিবেচ্য বিষয় নয়, দেশের কল্যাণ-অকল্যাণই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। সম্রাট আকবরের শাসন সামগ্রিকভাবে উত্তর-ভারতের পক্ষে কল্যাণকরই হয়েছিল, তাই আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলতে বঙ্কিম দ্বিধাবোধ করেন নি। পক্ষান্তরে এই আকবরই 'প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন', এ কথাও তিনি সমান জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। কারণ তাঁর মনে আকবরের বঙ্গবিজয় বাঙালির পক্ষে কল্যাণকর হয়নি।

এবার আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তৎকালীন হিন্দু-জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হতে পেরেছিল কিনা। মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু' নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-দর্শন পত্রিকায় (১২৮০ পৌষ) লেখেন "তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।...বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যত দিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে,...ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।" দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাংলাদেশ যেমন একা হিন্দুর দেশ নয়, তেমনি শুধু হিন্দুকে নিয়েই বাঙালি জাতি গঠিত নয়। বাংলাদেশ যেমন হিন্দু-মুসলমানের দেশ, বাঙালি জাতিও তেমনি হিন্দু-মুসলমানের জাতি। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াস ছাড়া বাঙালি জাতির প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নেই। 'উচ্চ শ্রেণীর' মুসলমান-দের স্বাতন্ত্র্যবোধই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবাঞ্ছিত বাঙালি-জাতীয়তার প্রধান অন্তরায়। দুঃখের বিষয় ঠিক সে সময়েই অঙ্কুরিত হল হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা-লালিত হিন্দু-জাতীয়তাবোধের বিষবৃক্ষ। সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল বাঙালিজাতীয়তাবোধের প্রাধান্য। এক দিকে উচ্চ শ্রেণীর মুসল-মানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং অপর দিকে নবগোপাল মিত্র মনোমোহন বসু ও রাজনারায়ণের প্রচেষ্টায় নবোদ্ভূত হিন্দুজাতীয়তার আদর্শ। এই দুই-ই হয়েছিল বঙ্কিম-লালিত বাঙালি জাতীয়তা-বিকাশের প্রধান অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ যে অনতিকালের মধ্যেই এই বাঙালিজাতীয়তার প্রতি প্রবলভবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার বহু নিদর্শন আছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এখানে সে প্রসঙ্গের উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও (১৮৪৫-১৯০৪) তৎকালীন হিন্দুজাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর এই বিরোধিতা ছিল বঙ্কিমের চেয়ে স্পষ্টতর। তা ছাড়া তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই পক্ষপাতী। এখানে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করে দিলেই তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ কত গভীর ছিল তা বোঝা যাবে। হিন্দুমেলার সংকীর্ণতা তাঁকে কতখানি মর্মপীড়া দিত তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে।—"বিংশতি কোটি ভারতবাসী যদি বৎসরে অন্ততঃ এক দিনও জাতি, ধর্ম, সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে ভারতের সৌভাগ্যসূর্য উদিত হইতে আর বিলম্ব নাই।...আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোনো

সংকীর্ণ ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত না করেন। আমাদিগের ভিক্ষা তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে 'হিন্দুমেলা' নাম না দিয়া ভারতমেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসবস্থল হয়। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন—আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোনো ভ্রাতার বিরুধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না। আমরা সকলকেই ইহার অভ্যন্তরে আহ্বান করিব। আমরা কোনক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দালদলি ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না।" এই উক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হিন্দুমেলাকে ভারতমেলায় রূপান্তরিত করার জন্য যোগেন্দ্রনাথের এই যে সনির্বন্ধ প্রার্থনা, সেকালে ওই মেলার নেতৃবর্গ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। আমরা কি আজ তার বিষময় ফল ভোগ করছি না?

যোগেন্দ্রনাথের প্রার্থিত 'ভারতমেলা' প্রতিষ্ঠিত হল না বটে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যে অনুরূপ আদর্শের প্রেরণায় স্থাপিত হল একটি নূতন সংঘ, নাম ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা 'ভারত-সভা' (১৮৭৬ জুলাই ২৬)। এই ভারতসভাকে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে যোগেন্দ্রনাথ লিখলেন—"যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন,... যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসী জাতি, ধর্ম সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন...সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত ১২ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা মহানগরীস্থিত আলবার্ট হলে 'ভারত-সভা' নামক এক নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন ভারতের পুনর্জন্মদিন। এই দিনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব রাজনৈতিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইল। ...এ ধর্মে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-জৈন, সেশ্বর-নিরীশ্বর, সাকার-নিরাকার, খৃষ্টান-হীদেন সকলই সমান। এই জন্যে ভারতসভা সকলকেই ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। ভারতবাসী! হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, সীক! আপনারা সকলেই এই সভায় যোগ দিউন। দেখিবেন, ভারতের সুখসূর্য অচিরাৎ সমুদিত হইবে।" ভারতসভা প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দু-মেলা ও জাতীয় সভার স্বীকৃত হিন্দুজাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যাত হল এবং হিন্দুমেলার মুখ্য নায়ক নবগোপাল মিত্রও এই নূতন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন, এমন কি তার অন্যতম অধ্যক্ষরূপেও বৃত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম-গত সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব নিঃশক্তি বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল না। বরং নানা কারণে তার শক্তি ও ব্যাপ্তি ক্রমে বেড়েই চলল। তাই দেখি 'ভারতসভা' স্থাপনের পরবর্তী কালে যোগেন্দ্রনাথের অসম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদেও পরোক্ষভাবে একটু সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়া লেগেছে। যোগেন্দ্রনাথ, 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' গ্রন্থের (১৮৯০) 'উদ্‌বোধন' অংশে লিখলেন—"শিবজীও একদিন হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্য ভবানী ও ভবানী-পতির ঘোরতর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তদীয় মহা-রাষ্ট্রীয় জাতির 'হর হর বোম্ বোম্' রবে একদিন সমস্ত ভারত উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই মহতী সাধনার বলে এক দিন মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়াছিল।...এস ভাই! আবার একবার পঁচিশ কোটি ভারতবাসী অসংখ্য সাম্প্র-দায়িকতা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া সেই দেবদেব ভগবানের নাম-কীর্তন করি। একবার এই জাতীয় দুর্গতির দিনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ জানাই। এস, আর দেরি করিও না। সময় আসিয়াছে। সকলে গগন বিদারিয়া গাও 'বন্দে মাতরম্', 'বন্দে হরিচরণারবিন্দম্'। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্‌ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি করুক।" এই যে স্বদে-শানুরাগের সঙ্গে ধর্মের মিশ্রণ, এখানেই নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ বিষবৃক্ষের বীজ। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উত্তরজীবনে ধর্মানুরঞ্জিত স্বদেশভক্তির পক্ষপাতী হয়েছিলেন। এখানেই আসে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রশ্ন। এই ধর্মপ্রতিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতির মধ্যেই সূচিত হল ভাবী কালের ধর্মানুগত দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা দেশবিভাগের পূর্বাভাস। তা ছাড়া, যোগেন্দ্রনাথের এই শেষের উক্তিগুলি কি প্রায় অনিবার্যরূপেই বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত শিবজী-উৎসব, ভবানী-মন্দির পরিকল্পনা এবং হিন্দুধর্মাশ্রিত বিপ্লবপ্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না! সবচেয়ে বড় কথা হল, নানা দিক্ থেকে হিন্দুজাতীয়তার নব-অভ্যুদয়ের এই যে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে স্বতঃই হক বা ইংরেজ সরকারের ইঙ্গিতেই হক অথবা দু-এর মিলিত প্রভাবেই হক দেশে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধও ক্রমেই প্রবল ও সক্রিয় হয়ে উঠছিল এবং ফলে লর্ড কারজনও বাংলাবিভাগে উৎসাহিত হয়ে-ছিলেন।

সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের প্রতি যতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তার চেয়ে কম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁর উপরে বঙ্গদর্শনের প্রভাবও হিন্দুমেলার চেয়ে কম ছিল না। তা ছাড়া তিনি ছিলেন যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদিত আর্যদর্শনেরও গভীর অনুরাগী পাঠক। ফলে তাঁর হৃদয় ক্রমশঃ পূর্বতন হিন্দুজাতীয়তার আদর্শ ছেড়ে অসম্প্রদায়িক বাঙালি-জাতীয়তা তথা ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি আকৃষ্ট হল। তাঁর মনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তার আদর্শই ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। ১৮৯২ সালে ইংরেজ সরকার যে শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তন করেন তার মধ্যেই প্রথম হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক বিচ্ছেদের বীজ বপন করা হল। তার কিছুকাল পরেই রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ (সাধনা ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক)। প্রবন্ধটি পঠিত হয় চৈতন্য লাইব্রেরিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে। সভায় পঠিত হবার পূর্বেই এটি বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। এই প্রবন্ধে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আজকাল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে, আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া...কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ—ইংরাজরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না।...ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের

মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে; কিন্তু আকবর যে-একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড-ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংরাজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে।" এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন—"একজন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ (আকবর) যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, একটি সমগ্র জাতির (ইংরেজের) নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না।"

আকবরের আদর্শ কি ছিল তার পরিচয়দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আকবর সকল ধর্মের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া যে-একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয় মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত, নিষ্ঠার সহিত, হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান পারসি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রিসভায়, হিন্দু বীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কোন রাজনীতির দ্বারা নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন।"

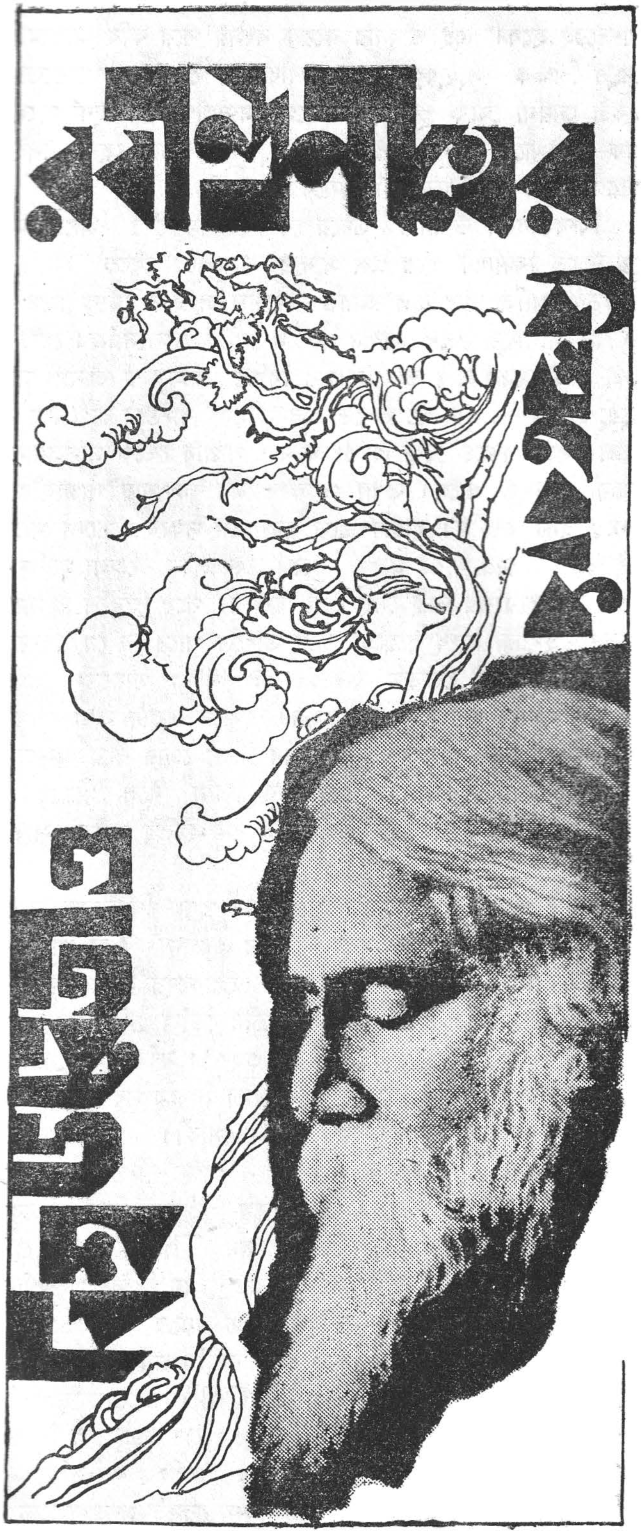
হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যে উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, তা সর্বতোভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের সানন্দ অনুমোদন লাভ করেছিল এ কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই তিনি তাঁকে ওই বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছিলেন। আকবর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং আকবরের উদার রাজনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টতর ও গভীরতর রূপে তাঁর 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩২৪ মাঘ)।—"মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল-সম্রাট্‌ আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে যেখানে ঐক্যের অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।"

এ তো অন্তরের মিলনের কথা। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল বাইরের সংসারে যেখানে অনৈক্য প্রবল হয়ে ওঠে সেখানে অন্তরের মিলনপ্রচেষ্টাও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বাইরের সাংসারিক অনৈক্য ও হানাহানি দীর্ঘকাল ধরে দেশটাকে অন্তহীন দুর্দশার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথও তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে তার শেষ বিভীষিকাময় রূপ দেখে যাবার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। তিনি নানা উপলক্ষে ও নানা ভাবে এই কঠিন সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, কারণ নিরূপণও করেছেন; কিন্তু তার সমাধানের কোনো সহজ সূত্র নির্দেশ করতে পারেন নি। কারণ কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তিনি এই সমস্যার যে তিতিক্ষা ও প্রতীক্ষা-সাপেক্ষ সমাধানের কথা বলেছেন ('হিন্দু-মুসলমান', ১৩২৯ শ্রাবণ), তা এই।—"সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। যুরোপ সত্যসাধন ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে।...আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে—তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই। কারণ, অন্য দেশের মানুষ যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব। যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

বলা বাহুল্য আমরা এখনও সংস্কারের গুটি কেটে মুক্ত জ্ঞানের আলোতে বেরিয়ে আসতে পারিনি। কারণ শিক্ষার অবাস্তবতা ও অব্যাপকতা এ ক্ষেত্রে যে শিক্ষার আলো মনের সংস্কার ঘোচাবার প্রধান সহায়ক, তা হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। যে ইতিহস আমরা পড়ি তা আমাদের জীবনপ্রতিষ্ঠ নয়, আমাদের সামাজিক ,সংস্কারমোচনের সহায়ক নয়। এখানে বলা কর্তব্য বাংলার (পূর্ব ও পশ্চিম) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং বিহার বা উত্তর প্রদেশের সমস্যা গুরুত্বে ও প্রকৃতিতে এক নয়। সুতরাং বাঙালির এই বিশেষ সমস্যার সমাধান হতে পারে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের শিক্ষার আলোকে। সামগ্রিকভাবে ভারত-ইতিহাসের সহায়তায় বাংলার সমস্যা-নিরসন সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীরভাবে বাংলার ইতিহাস-চর্চার কোনো ব্যবস্থা এখনও হয়নি, অদূর ভবিষ্যতে হবার কোনো লক্ষণও দেখা যায় না। সুতরাং বলা যায়, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সমতাবিধানের আশু সম্ভাবনা নেই। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় বাণীর প্রতিধ্বনি করে বলতে হয়—আমাদের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বাংলার ইতিহাস-চর্চার ব্যবস্থা চাই, নইলে বাঙালির ভরসা নাই।

১৩ বৈশাখ, ১৩৮৫



প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কবির ভাষায় বলি 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলার দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো'। বিশ্বভারতী বিশেষ কোনো সরকারী আইনের বলে একদিন বিশেষ একটি স্থানে, বিশেষ দেশ, বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ নগরীর নামে সৃষ্ট হয়নি। ভারতের প্রায় একশটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাদের নাম এইভাবে প্রদত্ত, যেমন—কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ আবার গুরু নানক, কুরুক্ষেত্র মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি। 'বিশ্বভারতী' এই শব্দের দ্বারা কোনো স্থান, ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা ধর্ম বোঝায় না—এটি একটি আইডিয়া। এই আইডিয়া কবির মনে ধীরে ধীরে জন্মায়। একদিন অকস্মাৎ এর আবির্ভাব ঘটেনি। 'বিশ্বভারতী' স্থাপিত হবার বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়সে বোলপুরের নিকট তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে পাঁচজন কিশোরকে নিয়ে তাঁর 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। একটি তিনকুঠুরির ঘরই ছিল ছাত্র-শিক্ষকের বাসস্থান। এই বাড়িটি নির্মাণ করেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে একটি বিদ্যাশ্রম রচনা করা। তাঁর অকালমৃত্যুতে তা সম্ভব হয়নি—রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের কল্পনাকে নতুনরূপ দান করে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষার দিন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে শিক্ষকও। সমস্যা হল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যাঁরা, তাঁরা জাতপাত মানেন না। ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের প্রশ্ন ব্রাহ্মণ ছাত্ররা কী করে কায়স্থের পদধূলি নেবে! রবীন্দ্রনাথও তখন মহাস্বাদেশিক তিনি যা বললেন তা হিন্দুসংহিতার বিরোধী। কয়েক বৎসর পর আরও সমস্যা দেখা দিল। আগরতলার ডাক্তার কাজীসাহেব ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তাঁর কন্যা সোফিয়া কাজি কলেজে পড়ে, তাঁর ইচ্ছা তাঁর একমাত্র পুত্র রবি কাজিকে শান্তিনিকেতনে ছাত্ররূপে পাঠাবেন। ব্রাহ্মণ শিক্ষকরা মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন—মুসলমান আর ব্রাহ্মণ একত্রে খাবে? পৃথক না হয় খেল, কিন্তু এক আচ্ছাদনের তলায় তো খাওয়া যায় না। সমস্যার সমাধান হল, যখন তাঁরা জানতে পারলেন পারিবারিক নানা কারণে রবি কাজিকে আশ্রমে পাঠানো হচ্ছে না! কালে সেই রান্নাঘরে খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা সৌকত আলিকে বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বয়ং খাবার জন্য নিয়ে যান। যদিও সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।

ব্রহ্মবিদ্যালয় গৃহের উত্তরে ছিল একটি খড়ের বড় ঘর, যেখানে ব্রাহ্মণ পাচক ও অন্যান্য ভৃত্যরা বাস করত বলে সে ঘরটার নাম ছিল চাকরদের ঘর। আর ছাত্র-শিক্ষকদের রান্নাঘর ছিল পশ্চিমে—আশ্রম সীমানার বাইরে। কারণ আশ্রমের ট্রাস্টপত্র অনুসারে—এই সীমানার মধ্যে জীবহিংসা নিষিদ্ধ ছিল। তাই নতুন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র-শিক্ষকদের রন্ধন ও আহারাদির ব্যবস্থা হয় আশ্রমসীমানার বাইরে। আশ্রমে ছাত্রদের নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা হয় ১৯০৫ সাল থেকে।

বিংশশতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা তথা হিন্দুজাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পর তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন, "ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি, শ্রদ্ধাবান করতে চাই। অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর

অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা ঠিক নহে।" কিন্তু এটাই কবিমনের পূর্ণ বিকাশ নিশ্চয়ই নয়। স্বদেশীযুগে কবি গান লিখেছেন, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। দেশকে বন্দনা করেও মনে হচ্ছে সবকথা বলা হয়নি। তাই লিখছেন স্বদেশের মধ্যে 'বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের চরণপাতা'। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও'— এই গানটি লেখেন বিলাত যাবার পূর্বে। সেই বিশ্বের সাথে পরিচয়ের জন্যই তার বিলাতযাত্রা। 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'যাত্রার পূর্বপত্রে' এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন খুবই স্পষ্ট-ভাবে। কবি লিখছেন, "য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে।" কবি একথা অস্বীকার করে বলেছেন, "মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে কোনো মঙ্গল দেখি না কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে।" কবির মতে 'আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে, কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে'। কবি মনের মুক্তি সেইসঙ্গে বিশ্বসাথে যোগের ভাবনা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে ও পরে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ দেখেন, তখন তাঁর মনে বিশ্বভারতীর স্বপ্ন জাগরিত হয়েছিল কি? তারপর এনড্রুজ ও পিয়ার্সনের সহিত পরিচয়ের ফলে কবির জীবনে এবং ঐ দুইজন পাদরির জীবনে যে পরি-পরিবর্তন আসে তা বিশ্বমানবতারই দ্যোতক। বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পর খৃষ্টান এনড্রুজ, খৃষ্টান পিয়ার্সন এলেন। তার পূর্বে আসেন কাপ্তেন পেটাভেল ও তাঁর স্ত্রী। জাতের বেড়া ভাঙতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। স্কুলের দুটি ছাত্র একটি মুসলমান অপরটি সাঁওতাল। দপ্তরীর কাজ শিখছে, বাঁধানোর কাজ শিখছে। তাদের নিয়ে পৃথক স্থানে ভোজন করছে দুজন স্কুলের ছাত্র।

বৃহত্তর জগতের ঘাত প্রতিঘাতে কবির মানসলোকে তার প্রতিক্রিয়ার ছবি আঁকা চলছে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে— জাতীয়তাবাদের উগ্রমূর্তি দেখা দিয়েছে দিকে দিকে। জাপান চীনের উপর উপদ্রব শুরু করেছে সেদিনকার চীনের গৃহযুদ্ধ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। কবি আছেন আমেরিকায় বক্তৃতা-সফরে। ন্যাশনালিজমের উগ্রতার তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা দিলেন জাপানে ও আমেরিকায়। ভারতে কবি হলেন রাজনৈতিক নিন্দার পাত্র। ন্যাশনালিজম্ যে বিশ্বশক্তির শেষ কথা নয়—একথা কবি স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন। Interdependence হচ্ছে সভ্যতার মৌল কথা।

১৯১৬ সালে কবি আমেরিকায় একাই গিয়েছেন বক্তৃতা সফরে। সেখান থেকে রথীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে যে পত্র লেখেন তাতে আমরা বিশ্বভারতী স্থাপনের প্রথম আভাষ পাই। কবি লিখছেন—"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" এই ভাবনার কয়েক বৎসর পরে কবি আশ্রমের তরুণ শিক্ষক সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখেন "ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন।"

বিশ্বভারতী ভাবনার উদয়ে যে বিদ্যাসমবায়ের আয়োজন হয় তাতে বিদ্যার্থী হয়ে এল সুদূর সিলেট থেকে সৈয়দ-মুজতবা আলি আর এল আরও সুদূর লাহোর থেকে জিয়া-উদ্দীন, নাগপুর থেকে এলেন খৃষ্টান বিনায়ক মাসোজি। মোট-কথা জাতপাতের বাঁধ ভাঙছে আর বিচিত্র মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে—'বিশ্বং যত্র ভবত্যে এক নীড়ম্' বাস্তবে রূপ নিতে চলল। মনে পড়ছে ছোট্ট একটা ঘটনা। পাঞ্জাব থেকে মুসলমান ছাত্ররা বেড়াতে আসে। তখন পাকিস্তানের কল্পনায় পাঞ্জাবীরা উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি। ছাত্ররা এসে রান্নাঘরে সকলের সঙ্গে খায় এই ঘটনা তাদের খুবই মুগ্ধ করে। তৎকালীন জেলা ম্যাজি-স্ট্রেট মিঃ কুরেশির ভাই সেই দলে ছিলেন। পরে কুরেশি আমায় বলেন, "ছাত্রেরা মুগ্ধ হয়েছে, তারা ভাবতে পারে না যে, হিন্দু মুসলমান একত্রে ভোজন করবে।" এ ঘটনা ভারতের আর কোথাও সম্ভব হত না সেই কালে। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই, কবি কখনো কোন কিছু জোর করে আশ্রম-বাসীদের উপর চাপাননি। তাঁর বক্তব্য তিনি বলে গিয়েছেন। তিনি জানতেন, যা সত্য তা একদিন আপনা হতেই স্বীকৃতিলাভ করবে।

এবার একটু ইতিহাসের কথা বলি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে। তার একমাস পরে শান্তি-নিকেতনে নিভৃতে মুষ্টিমেয় সমদরদী লোকদের নিয়ে শান্তি-বাদ ও বিশ্বমৈত্রীর প্রতীক বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল (ডিসেম্বর ২৩, ১৯১৮, ৮ই পৌষ ১৩২৫)। কবির সৃজ্যমানস (creative mind) যে শুধু সাহিত্য বিষয়ে নব নব সৃষ্টি করে চলে তা নয়, শিক্ষাবিষয়েও তা সম্প্রসারী। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আঠারো বৎসর পূর্ণ হয়েছে, কবির মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনের জন্য কিছু করণীয় আছে। এমনসময় দক্ষিণ-ভারত থেকে বক্তৃতাদানের আহ্বান এল; কবি লিখলেন The Centre of Indian Culture। তাঁর মাথায় ঘুরছে তখন বিবিধ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র স্থাপনের কথা। দক্ষিণ-ভারত সফরে যান ১৯১৯ সালের গোড়ায়। কলকাতায় ফিরে এসে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে কবি তাঁর The Centre of India Culture ভাষণটি পাঠ করলেন (মার্চ ২৭, ১৯১৯, ১৩ চৈত্র ১৩২৫)। এই হল বিশ্ব-ভারতীর ভূমিকা। ১৯১৯ সালের মে মাসে শান্তিনিকেন পত্রিকায় কবি সর্বপ্রথম বাংলায় তাঁর 'বিশ্বভারতী' সম্বন্ধে মনের কথা বললেন। এই প্রবন্ধে কবি যা লিখলেন তা জিজ্ঞাসু পাঠক সামান্য সন্ধান করলেই পাবেন। কলকাতায় ভাষাদানের তিন-মাস পরে, গ্রীষ্মকালের শেষে বিদ্যালয় খুললে অত্যন্ত দীনভাবে 'বিশ্বভারতীর' কাজ শুরু হল। অধ্যাপনা ছাড়া অধ্যয়নও সে শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য এই মত প্রতিষ্ঠিত হল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যান, য়ুরোপ থেকে প্রত্যাগমন করে কবি বিশ্বভারতীকে সাধারণের হাতে উৎসর্গ করবার জন্য সভা আহ্বান করলেন (১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর). সেই সভার সভাপতি ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। সেদিনকার ভাষণে আচার্য বিশ্বভারতীর মর্মার্থটি অতি সুন্দরভাবে বললেন। তিনি বললেন যে, "বিশ্বভারতীর আক্ষরিক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন, আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ধ্বনিগত অর্থ আছে—বিশ্ব-ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে"।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন যা বলেছিলেন তার মধ্যে ভাববার কথা আছে। অর্ধশতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর ও ভারতের যে পরিবর্তন হয়েছে তা অভাবনীয়. কিন্তু কবির বক্তব্য ভবিষ্যৎ বাণীর ন্যায় সত্য। তিনি বললেন, "কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্য-বশত ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে।" তিনি প্রশ্ন করলেন "স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব"?

বৃটিশ সাহিত্যিক রুডিয়ার্ড কীপলিং লিখেছিলেন—The East is East, and West is West, And the twain can never meet". বিশ্বভারতীর মন্ত্র 'যত্র বিশ্বং ভবত্যে এক নীড়ম্'। আদর্শ হল "To seek to realise is a common fellowship of study the meeting of the East and the West, and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace through the establishment of free communication of ideas between the two hemispheres". কবির স্বপ্ন বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে। কবি উক্ত memorandum-এ লিখেছেন এই শান্তিনিকেতনে ভাবীকালে "And with such ideals in view to provide at Santiniketan aforesaid a Centre of Culture where research into and study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and Civilisation may be persued along with the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary for true spiritual realisation, in amity, good fellowship, and co-operation between the thinkers and Scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste and in the name of the One Supreme Being who is Shantam, Shivam, Advaitam".

এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যেবার বিলাত যান, সেবার সেখানে কেদারনাথ দশগুপ্ত The Union of East and West Soceity-র উদ্যোগে Caxton Hall-এ কবির সংবর্ধনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন, কবির সে ভাষণগুলি Sadhana নামে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণগুলিতে কবির ধর্ম, সমাজদর্শন ও বিশ্ববোধের আভাষ পাই।

সর্বাকিছু বিভেদের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী ও বিশ্বমানবতাবাদ একই অর্থবোধক। এই কথা কবি স্পষ্ট করে বলেন 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে। এতকাল ধর্ম হয়েছে সম্প্রদায় কেন্দ্রিক—যেমন, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইসলাম ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম। তাদের প্রত্যেকটি বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত, মানুষকে পরপারের কাছে নেবার অনেক বাধা—ঈশ্বরই মানুষের মিলনের বাধারূপে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই কবি বললেন ধর্ম একটাই—তা হচ্ছে মানুষের ধর্ম। শেষ গান লিখলেন 'ঐ মহামানব আসে'। মহামানব কোনও মহাপুরুষ নয়,—মহামানব হচ্ছে The MAN। অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতীক 'মহামানব'।

রবীন্দ্রনাথ: মানুষের সম্পর্কে

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র জীবনের শেষ দশ বছর অর্থাৎ ১৯৩১-৪১, তাঁর জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সুবিদিত কবির অনুবৃত্তি মাত্র নন, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নতুন ব্যক্তি, যাঁর জীবন আশিতে শেষ না হয়ে শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপ্ত হলে, আমরা পেতাম নতুন এক কবিকে। কেন একথা বলছি তা প্রতিপন্ন করাই হল এই লেখার উদ্দেশ্য। কে না জানেন শেষ দশ বছরে রবীন্দ্রনাথ লেখার সংগেই একান্ত মনে করেছিলেন আঁকার চর্চা এবং তাঁর ছবি অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তা রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাত শিল্প প্রত্যয় থেকে দুর্ধর্ষ রকম আলাদা। জৈব অস্তিত্বের সংগে জড়িত যেসমস্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা, যেসমস্ত বিকার বৈপরীত্যকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেননি, ছবিতে তারাই এসে সিংহভাগ নিয়ে জুড়ে বসেছে। অনাবৃত বিকল বীভৎস বাস্তবকে সসম্মানে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। এই জন্যেই একথা বলতে পারা যায় না কি যে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ এমন একজন পৃথক ব্যক্তি, যাঁর মানব সত্তার সংগে বলাকা ও মহুয়ার কবির আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব? কিন্তু কেন? তার মূল খুঁজতে হলে যেতে হবে শিল্পীর মনোলোকে, যে মন বর্তিত হয়েছিল ফ্রয়েডোত্তর কালের চিন্তায় এবং যার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল পিকাসো ও মাতিসের শিল্প-দর্শন। এটা কি নিতান্তই আকস্মিক, না পূর্বাপর বিবর্তনের ফল? আমার বক্তব্য শেষোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে। আমার ধারণা শেষ দশ বছরে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা, জীবন ও জগৎ চিন্তা দৃঢ় পায়ে এমন একটি প্রত্যয়ে চলে আসছিল, যা বিশ শতকের বেশী নিকটবর্তী এবং তা সম্ভব হয়েছিল সজাগ অনুশীলনের ফলেই।

এই প্রত্যয়ের স্বরূপটা সংক্ষেপে বলছি, জগৎ ও জীবন বিকাশের মূলে কোন অচিন্ত্য পারমার্থিক সত্তার ক্রিয়া আছে, এ বিশ্বাস তাঁর মন থেকে স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানসিদ্ধ বস্তুসত্তার দিব্য বা প্রাণময় বিকাশকে তিনি প্রাকৃতিক কার্যকারণ সূত্রে বাঁধারই প্রয়াসী হয়েছিলেন। নৈবেদ্য গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রূপ আমরা দেখি বলাকা পূরবী ও মহুয়ার রবীন্দ্রনাথে। মোক্ষবাদী রবীন্দ্রনাথ সেখানেই প্রথম হন জীবনবাদী তারপর প্রান্তিক রোগশয্যায় আরোগ্য জন্মদিনে এসে তিনি হন পরিপূর্ণ প্রত্যক্ষতাবাদী। ঐতিহ্যানুগামী সমালোচনা অবশ্য এই ক্রম বিবর্তনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে খোলা চোখে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে যুগ সংস্কৃতির প্রভাবই ঘটিয়েছিল এই রূপান্তর তাঁর মানসিকতায়। নব্য পদার্থবিদ্যা যেদিন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর অন্তর্লোকে অফুরন্ত তেজের সংগেই অত্যাশ্চর্য শৃংখলায় রহস্য আবিষ্কার করেছে, জীবতত্ত্বও পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব জৈব অস্তিত্বের মৌল প্রবণতাগুলিকে টেনে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে এনেছে, মার্ক্সীয় দর্শন যেদিন বুঝিয়েছে উৎপাদন ও লভ্য আহরণের একচেটিয়া অধিকারই সমাজে অস্তিবান এবং নাস্তিবান দুই পৃথক শ্রেণী সৃষ্টি করেছে, সেদিন পুরাতন

মূল্যমানগুলি আঁকড়ে থাকার মত অনড় মন ত রবীন্দ্রনাথের ছিল না। যুগ সংস্কৃতির সার্বিক অগ্রযাত্রার সঙ্গে চলার সজীবতা তাঁর অব্যাহত ছিল পঁচাত্তর বছরে পা দিয়েও। এর জোরেই তিনি নিজের সীমানা নিজেই অতিক্রম করেছিলেন এই অধ্যায়ে।

সংকোচের সঙ্গে বলছি, এই সার্থক সমাপ্তির অধ্যায়ে আমি রবীন্দ্রনাথের নিকট সাহচর্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। দেখেছি তিনি আইনস্টাইন ম্যাক্স প্লাঙ্ক মিলিকান প্রমুখ বিজ্ঞানীর রচনা মন দিয়ে পড়েছেন। শুধু পড়া নয়, বিশ্বপরিচয় নামক বইয়ে তিনি নতুন বিশ্ববোধ ব্যাখ্যাও করেছেন। প্রাণতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নিয়েও কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল, যা শারীরিক অপটুতার জন্যে পারেননি। সে ভার দিয়েছিলেন অন্যদের ওপর। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ থেকে বেরিয়েছে দুখানি বই এ বিষয়ে। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে তার বেশীর ভাগ পৃষ্ঠাই ভরে আছে রবীন্দ্র লেখনীর পরিমার্জনায়। আর এও বোধ হয় জানেন না যে ফ্রয়েড এডলার ইয়াং প্রভৃতির লেখাও তিনি পড়েছিলেন মোটামুটি। পড়েছিলেন বংশানুক্রম ও আচরণতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধেও প্যাভলভ ওয়াটসন প্রমুখের বইপুঁথি কিছু কিছু। আসলে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে সারা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছিল মননশীলতার যে পরিবেশ, তা থেকে তদানীন্তন তরুণ আমরা যেমন প্রেরণা পেয়েছিলাম, তেমনি পেয়েছিলেন আমাদের প্রধানতম আচার্য রবীন্দ্রনাথও। তাই দর্শন ইতিহাস সাহিত্য শিল্প কলা কৃষ্টি ও সমাজ চেতনার মৌল ভাবনাগুলিই আমূল পাল্টে গিয়েছিল তাঁর। নতুন কালের দৃষ্টি ও মূল্যবোধ নিয়ে নবভাবে পুনর্বিচার শুরু করেছিলেন তিনি সব কিছুর। এই রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পূর্বতন সত্তার সাক্ষাৎ প্রতিবাদ বলে নিতে তাই কোনই অসুবিধা নেই। একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যান সোভিয়েট মুল্লুক ভ্রমণে এবং তাও তাঁর মানসিক বিবর্তনের পথে অল্প সহায়তা করে নি।

রাশিয়ার সমাজ বিধান বলাই বাহুল্য তাঁকে অবাক ও অভিভূত করে তার অভিনবতার জন্যে। এই অধ্যায়ে তিনি অবহিত হলেন দেশের সেই সব মানুষ ও তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে, যাঁরা শ্রম দিয়ে সভ্যতার ইমারত গড়ে নিজেরা থাকেন রিক্ততার অন্ধকারে এবং যাঁদের কাঁধে ভর রেখেই ক্ষমতা ও বিত্তের অধীশ্বররা ওঠেন ভাগ্য ও ভোগের সর্বোচ্চ তলায়। অর্থাৎ দারিদ্র্য বস্তুটা যে মানুষের সৃষ্টি এবং সমাজের উৎপাদন যন্ত্র আয়ত্তে রেখে তার সাহায্যে উদ্বৃত্ত মূল্যে আহরণ ও শাসন তক্ত অধিকার করেন যে মুষ্টিমেয় মানুষ, তাঁরা এবং তাঁদের সাগরেদরাই যে দুহাতে বঞ্চনা বিলিয়ে সেই পটভূমিতে ত্যাগের আদর্শ প্রচার করেন, আর সকল ও আত্মজ্ঞান ঋদ্ধ দিব্য-জীবনের বাণী শোনান, এ তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন। দুই বিঘা জমি ও পুরাতন ভৃত্যের দরদী মানবতাবোধ এ নয়, এ হল সেই সাম্য দৃষ্টি, যে দৃষ্টি হুজুরে মজুরে কৃত্রিম ব্যবধানের বেড়া ভেঙে নতুন সমাজের বনিয়াদ গড়তে চায়। হয়ত যে রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে রুশরা সম্ভব করেছিলেন এই নতুন সমাজের আবির্ভাব, তার সম্বন্ধে তাঁর কবিমনে কোথাও একটু অননুমোদন ছিল। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে ওটুকু কেটে যেত তাঁর ১৯৪৭-এর পর আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে। রাশিয়ার চিঠি কালান্তর সাহিত্যের পথে পথের সঞ্চয় ও সভ্যতার সংকটে এই নতুন রবীন্দ্রনাথের একটা দিক দেখেছি আমরা রোগশয্যায় আরোগ্য ও জন্মদিনে দেখেছি আর একটা দিক। এই রবীন্দ্র-নাথকে বোঝা ও বোঝানর প্রয়াস হয়নি আজও, এ আমাদেরই দুর্ভাগ্য। অথচ এই অধ্যায়ের উপলব্ধি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচিতি সম্ভবই নয়।

এই রবীন্দ্রনাথ এমন এক ব্যক্তি যাঁর অন্তরে দুর্বার একটা অস্থিরতা জেগেছিল সেই সব মানুষের জন্যে, যাঁরা নদীতে জাল ফেলেন, মাঠে যাঁরা চাষ করেন, যাঁরা সার্বিক শ্রমের বিনি-ময়ে নগর বন্দর ও কল কারখানা চলন্ত রাখেন। অথচ নিজেরা যাঁরা রিক্ত, নিঃস্ব সর্বহারা। দূরে থেকে দেখা এই শ্রমকারী নীচু-তলার মানুষদের মধ্যে নেমে গিয়ে, তাঁদের এক জন হবার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। স্বাগত জানিয়েছেন অনাগত দিনের সেই কবিকে, যিনি উঠবেন এঁদের মধ্যে থেকেই এবং মুখর করবেন এঁদের অন্তরের অকথিত বেদনাকে। ধিক্কার দিয়েছেন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সেই ধারক বাহকদের, যাঁরা মানুষের এই অধো-গতির পণ্যে আপন লাভের তহবিল পূর্ণ করছেন। শেষের দশ বছরে পূর্ণ পরিণতিতে উন্নীত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এইভাবে। এ রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রাণরসপুষ্ট অধ্যাত্মবাদী কবি নন, নন বাউল বৈষ্ণব ও সন্তসাধকদের ভাবধারায় উজ্জীবিত ভক্তি-বাদী কবি, তপোবন সংস্কৃতির (যে সংস্কৃতি কোনদিন ছিল না) ব্যাখ্যাকার, তত্ত্বদর্শী, মানব মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেম প্রচারক কবিও নন। এ রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী, বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বোধির সমর্থক। এই দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথকে মোটেই চিনি না আমরা। শুধু তাই নয়, আমরা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছি হয় কতক-গুলি ভ্রান্ত ধারণায় কুয়াশায়, নয় কতকগুলি সুবিধাবাদী সিদ্ধান্তের হেঁয়ালিতে। আমরা তাঁকে পূর্বাপর এক জাতীয়-তাবাদী ভাবুক ও ধর্মপ্রবক্তা পাদ্রী সাজিয়ে রেখে, তাঁর মহিমান্বিত সমাপ্তিকে অমর্যাদা করেছি। করেছি অধ্যাত্মবাদী এক কোমল কান্ডে পদাবলী রচয়িতা কবি সাজিয়ে রেখে।

কেন এরকমটা হয়েছে তার উত্তর স্পষ্ট। কায়েমি স্বার্থে দত্ত প্রত্যয় আমাদের মন অধ্যাত্ম রসপুষ্ট সত্তা একটি জাতীয়তা-বাদের বাতাবরণে আবৃত করেই রাখতে চেয়েছে রবীন্দ্রনাথকে, যেহেতু এইভাবে তাঁকে ভাঙিয়ে আমাদের সমস্ত মূঢ়তা, দৈন্য ও অকৃতার্থতার সাফাই গাওয়া সহজ। এই বাতাবরণ প্রথম তৈরি করেছিলেন অজিত চক্রবর্তী, একদেশদর্শী একটি জীবনদেবতা-বাদের ছক তাঁর সমস্ত গীতি-কবিতার ওপর আরোপ করে। তারপর এটাই গৃহীত তত্ত্ব রূপে চলেছে। এরপর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আর দুটি বাদ সংযোগ করেছেন, তা হল গতিবাদ ও মুহূর্ত সম্ভোগবাদ। এই ত্রিবিধবাদের দাপটেই বরবাদ হয়েছে পরবর্তীদের রবীন্দ্র চর্চা। এ থেকে মুক্ত করে আনতে হবে প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে। শেষ ধাপে যিনি ভাবের স্বর্গ থেকে বাস্তব মাটির কাছাকাছি চলে এসেছিলেন, আর্ত প্রকাশ

(শেষাংশ ১০০৪ পৃষ্ঠায়)

সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সুস্থ সংস্কৃতির এক অনির্বাণ জ্যোতির্ময় শিখা। তাঁর আবির্ভাবের আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা কী ছিল আর তিনি যখন এ মর-সংসার থেকে বিদায় নিলেন তখনই-বা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল—এই দুইয়ের প্রতিতুলনা করলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একক চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছিলেন। আমরা আপাতত তাঁর বহুমুখী সৃষ্টিশীল প্রতিভার দানের অজস্রতা ও ঐশ্বর্যের কথা ধরছি না, হিসাবের মধ্যে একথাও গণ্য করছি না যে তিনি তাঁর সর্বাতিশায়ী ক্ষমতায় একাই ছিলেন একশো। সে একটা ভিন্নতর প্রসঙ্গ, তার আলোচনা অন্য কোন উপলক্ষে করা যেতে পারে, কিংবা এই আলোচনা আমাদের সাম্প্রতিক সমালোচনা-সাহিত্যে এত হামেশাই হয় যে এখানে আর তার পুনরাবৃত্তির সার্থকতা দেখি না। আপাতত যেটা আমাদের বিবেচ্য তা হল রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা শিল্প-সাহিত্যের জগৎ থেকে রবীন্দ্র-সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যের জগতের সুরের মৌলিক ভিন্নতা। এই ভিন্নতার পরিমাপ করতে গেলেই আমরা দেখতে পাব রবীন্দ্রনাথ কত দিক দিয়ে কত ভাবে বাংলার সংস্কৃতিকে নির্মল ও পরিশোধিত করে গিয়েছিলেন. কবির আগের ও পরের বাংলা সাহিত্য—সে যেন দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রহলোক, একটির সঙ্গে আরেকটির যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ও যেখানে এসে থেমেছিলেন, সেখান থেকে আর পুরাতন যুগে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না—পুরাতন যুগের রুচি বিশ্বাস অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির আদল তিনি এমনভাবে বদলে দিয়েছিলেন যে রবীন্দ্র-যুগ থেকে বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে নতুন পথ-পরিক্রমার শুরু হয়েছে, ওই পথ-চলার ভঙ্গির সঙ্গে গত যুগের ধরন-ধারণ করণ-কারণের কোনই মিল নেই।

কোন জাদুর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিরাট, প্রায়-অবিশ্বাস্য পরিবর্তন সংঘটিত করেছিলেন? সে কি শুধুই তাঁর সৃষ্টির প্রাচুর্য ও বহু বিচিত্রপথগামী কল্পনার সমৃদ্ধি? নাকি ওই জাদুর মূলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতারও একটা মস্ত বড় ভূমিকা ছিল? তাঁর সৃষ্টিশীলতার ব্যাপ্তি, গভীরতা, অজস্রতা, বৈচিত্র্য ও অক্লান্ত নিরবচ্ছিন্নতার কথা ছেড়ে দিলেও, আমাদের মনে হয় কবি যে-দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন, জগৎ ও মানুষকে দেখেছিলেন সেই দৃষ্টিকোণটাই ছিল এক অসামান্যতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত যে-অসামান্যতার মধ্যে তাঁর অন্যপরতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হয়েছিল অত্যন্ত অমোঘ ও অসংশয়িত রূপে। কবির এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিকোণের একটু হিসাব-নিকাশ করা যেতে পারে।

কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের কলকাতার এক শীর্ষস্থানীয় অভিজাত ও বিত্তসচ্ছল পরিবারে। কিন্তু ধনী গৃহের বিলাস-ভোগের সংস্কার তিনি নিজ জীবনে গ্রহণ করেননি, বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন সংযম-শাসনে শাসিত ও আচার-আচরণ অতিরেকের মোহ বর্জিত। তিনি জমিদার-সন্তান, জমিদার-গৃহের তদানীন্তন জীবনযাত্রার রীতি অনুযায়ী তাঁর পক্ষে আমোদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া এমন কিছু অন্যায় বা অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য আত্মসংবরণের ক্ষমতার দ্বারা তিনি চারদিককার ক্লিন্ন আবহাওয়া থেকে নিজেকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই প্রথম বয়সে তিনি যে সকল কাব্য, সঙ্গীত ও গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন তার মধ্যে নাগরিকতার সংস্কার প্রবল এবং জনজীবনের বাস্তবতার ছোঁয়া

প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু এই ত্রুটিপূর্ণ একদেশদর্শিতা ও একাঙ্গিতা তিনি অচিরেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন গ্রাম-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূত্রে। জমিদারী কার্য পরিচালনার উপলক্ষে যখন থেকে বাংলার পল্লীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হল, তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবিমিশ্র আনন্দবাদ আর রইল না, তার ভিতর বাংলার বৃহত্তর জনজীবনের দুঃখের চেতনা প্রবেশ করল। সেই থেকে তিনি আর কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক শিল্পী রইলেন না, হয়ে উঠলেন গোটা বাংলাদেশের শিল্পী। বাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা তাঁর চৈতন্যের মর্মমূলে প্রবেশ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের গোত্রান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেল। 'চিত্রা' কাব্যের "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি অমনি লেখা হয়নি। ওই ঐতিহাসিক রচনাটি কবি-ব্যক্তিত্বের বিবর্তনের একটি লক্ষণীয় ধাপ।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। নাগরিকতার পরিমণ্ডলের মধ্যে বসে কবি প্রথম বয়সের কাব্য-কবিতা রচনা করলেও অশালীনতা কিংবা রুচিদৈন্য কিন্তু তাঁর রচনাদেহকে কখনোই স্পর্শ করেনি। ওই পর্বের কবিতায় দেহবাদী মনোভঙ্গি অর্থাৎ যৌনতার স্মারক শব্দচিত্র প্রয়োগের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, ইচ্ছা করলেই নাগরিক শিল্পাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি তাঁর তখনকার একাধিক কবিতায় কল্পনার লাগামে আলগা দিতে পারতেন। কিন্তু এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, স্বেচ্ছা-সংযমের বর্মে আপনাকে আবৃত করে কলকাতা শহরের যুবক-কবি তাঁর বয়সের পক্ষে বেমানান আত্মশাসন দ্বারা কীভাবে তাঁর কাব্যসৃষ্টিকে মণ্ডিত করলেন সে একটা রহস্য হয়েই থাকল। এই রহস্যের তল পাওয়া যাবে না যদি-না আমরা স্মরণে রাখি যে, জীবনের একেবারে সূচনা থেকেই কবি বাংলা সাহিত্য-সংসারের তৎকালপ্রচলিত সাংস্কৃতিক সংস্কার ও রীতিনীতি জেনেশুনে বর্জন করেছিলেন এবং তার জায়গায় সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ সম্পর্কে স্বীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন।

দেখা যায় তাঁর প্রাথমিক পর্বের রচনাগুলিতে বয়সোচিত আঙ্গিকগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও অমার্জিত রুচির ছাপ নেই। তিনি যখন ছাপার অক্ষরের জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন সেটা গত শতকের সত্তরের দশকের শেষার্ধ ভাগ। অর্থাৎ বয়স তখন তাঁর চোদ্দ-পনেরো পেরিয়েছে তার আগে বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়া খুব নির্মল ছিল এমন বলা চলে না। বরং এই বললেই ঠিক বলা হয় যে, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেম-নবীন-বিহারীলাল প্রমুখ কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনা বাদ দিলে সাহিত্যের অবশিষ্ট অংশে কুরুচির দাপট খুবই প্রবল ছিল। সেই সর্বাত্মক রুচি-দৈন্যের প্রভাব কিন্তু বালক রবীন্দ্রনাথের উপর বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। তিনি ওই বয়সেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বীয় রুচির বোধ নিজেই নিজের ভিতর থেকে উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন এবং তার আলোকে পথ চিনে চলেছিলেন। একথা সত্য যে, গীতি-কবিতার আদর্শের প্রেরণাটি পেয়েছিলেন তিনি তাঁর অব্যবহিত পূর্বসূরী বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে কিন্তু রুচিটি ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। এই রুচি তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন আপনার স্বপ্ন-কল্পনা-ভাবনা-ধারণার জগৎ থেকে তাঁর একান্ত অনুভূতিপরায়ণ সংবেদনশীল কবি-অন্তর থেকেই সেই রুচির উৎসার এবং সেখানেই ওই রুচির মূল। রুচির এই স্বকীয়তাই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথকে সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে তাঁর গোটা ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রয়োগে প্রণোদিত করেছিল।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ 'কড়ি ও কোমল'-এর কিছু কবিতা (চুম্বন, বাহু, স্তন ইত্যাদি); 'মানসী' কাব্যের ব্যক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম, নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, প্রভৃতি; 'সোনার তরী' কাব্যের নিদ্রিতা সুপ্তোত্থিতা, ঝুলন, ব্যর্থ যৌবন ইত্যাদি; 'চিত্রা' কাব্যের উর্বশী, বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতা এবং 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের মধ্যে রুচির স্খলন প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করেন এবং সেই নজিরে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনতে চান দৃষ্টান্তস্বরূপ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আজকের দিনের উদার ও পরিশীলিত সাহিত্যনীতির মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এমনতর অভিযোগ কত-না হাস্যকর বলে মনে হয়। কবি উল্লিখিত কবিতাগুলির কোন-কোনটিতে নারীদেহ বর্ণনা করলেও মনে রাখতে হবে যে ওই বর্ণনা সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিসুলভ শ্রেষ্ঠ ধ্বনির শাসন দ্বারা সুরক্ষিত; শব্দের লাবণ্য, মাধুর্য ও শ্রুতিলালিত্য নারীদেহ বর্ণনার বাস্তব শারীরসংস্থানচেতনাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দিয়েছে। রুচিদৈন্যের একটা প্রধান উৎস হল অনুভবের স্থূলতা ও তজ্জনিত শব্দের কার্কশ্য। রবীন্দ্র-কাব্যে এ জিনিস সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। সুতরাং কোন্ রন্ধ্রপথে রুচিবিকার রবীন্দ্র-রচনায় প্রবেশ করবে? তথাকথিত আধুনিক বাস্তববাদী কবিরা বাস্তবতার নাম করে প্রায়ই তাঁদের কবিতায় আটপৌরে ও কাঠখোট্টা শব্দের সমাবেশ ঘটান এবং অহেতুক অন্তরের অনুভবকে ছাল ছাড়িয়ে প্রকাশ করেন। আমাদের বোঝা দরকার যে, ওই ছিদ্রপথেই প্রায়শ রুচিদৈন্য কবিতাদেহকে আক্রমণ করে ও তাকে অসুস্থ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরতা ও সুস্থতার এক প্রতিমূর্তি। তাঁর কাব্য ধ্বনির সুষমায় আগাগোড়া মণ্ডিত, শ্রুতির সৌগন্ধ্যে অনুলিপ্ত! সুতরাং অশ্লীলতার অভিযোগ তাঁর কাব্যের বেলায় মোটেই টেকে না।

আমরা অপসংস্কৃতি ও রুচিবিকারের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই সংগ্রাম করব কিন্তু রক্ষণশীলতার শুচিবাইকে যেন কখনও সুস্থ সংস্কৃতির সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি। নীতিবাগীশতা আর রুচির পরিচ্ছন্নতা এক জিনিস নয়। রবীন্দ্র-রচনার প্রতি একদা যাঁরা অশ্লীলতার অপবাদ আরোপ করেছিলেন তাঁরা প্রমাদবশত শুচিতা ও শুচিবাইকে সমীকৃত করে ফেলেছিলেন। তাঁদের মজ্জাগত রক্ষণশীলতাই এই অনুচিত সমীকরণের জন্য দায়ী।

আবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগও করা হয়। কোন কোন মহল থেকে বলা হয় যে তিনি ব্রাহ্ম নীতিবাদ দ্বারা অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, ফলে জীবনের স্বাভাবিক কামনা-

বাসনার সার্থক প্রকাশ তাঁর কাব্যে ঘটেনি। দেহগত চাওয়া ও পাওয়ার সুতীব্র উত্তেজনার আনন্দ তাঁর রচনায় দুর্লক্ষ্য; রবীন্দ্র-শিল্প অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয়তার চাপে রক্তশূন্য পান্ডুরতার ব্যাধিতে আক্রান্ত। বরং জৈব কামনা-বাসনার একান্ত প্রত্যাশিত অভিব্যক্তির শিল্পে গোবিন্দ দাস, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ কবিরা তুলনায় অনেক বেশী জীবনের কাছাকাছি ছিলেন। একজন প্রখ্যাত সমালোচক (ডক্টর সুশীলকুমার দে) বাস্তবতার মাপকাঠিতে দীনবন্ধু মিত্রের জীবন-চিত্রণকে 'ব্রাহ্ম শালীনতায়' অধিকৃত রবীন্দ্রনাথের জীবন-চিত্রণের চেয়ে অনেক বেশী স্বাভাবিক বলতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, শশাঙ্কমোহন সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সমালোচনা (রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তার বিরুদ্ধে সমালোচনা)—ও স্মরণ-যোগ্য।

এর উত্তরে বলব, কে কীভাবে সাহিত্যকে দেখেন তার উপরেই নির্ভর করে সাহিত্যের বিচারের তারতম্য। পূর্বেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার পর সাহিত্যের পুরাতন ধ্যান-ধারণার আমূল রূপান্তর সাধিত হতে চলেছিল—ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে। তিনি তাঁর একক শিল্পী-ব্যক্তিত্বের দ্বারা গোটা আবহাওয়াটাকেই পাল্টে দেবার উপক্রম করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও সাহিত্যে দেহবাদীও ছিলেন না আবার কট্টর নীতিবাদীও ছিলেন না। তিনি সর্বদাই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের সাধক ছিলেন, 'সুবর্ণ মধ্যম'-এর পথাবলম্বী ছিলেন। জীবন ও জগৎকে দেখার ভঙ্গিমায় তিনি ছিলেন স্থির, শান্ত, আত্মসমাহিত, অনুদ্বেজিত, অনুদ্বেল। কাজেই মানবীয় কামনা-বাসনার প্রকাশে তিনি প্রাকৃতজনোচিত উদ্দামতার সংস্কারকে যেমন প্রশ্রয় দেননি তেমনি রক্ষণশীল নীতিবাগীশের আসনে সমাসীন হয়ে নীরক্ত অস্বাভাবিকতার পক্ষেও পাঁতি দেননি। কবির জীবন-রূপায়ণ তথা চরিত্র-চিত্রায়ণ দুই প্রান্তীয় বিচ্যুতিকে বাঁচিয়ে বরাবর 'ঝম্ ঝম নিকায়' বা মধ্যপথ ধরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছে। যুগে যুগে জ্ঞানীদের এইটেই পথ—তাঁরা প্রবৃত্তির অমিতাচার ও প্রবৃত্তি-শূন্যতা এই দুই চরমকেই সযত্নে এড়িয়ে চলেন। রবীন্দ্রনাথ তো শুধুই কবি নন, তিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠও বটেন। কবির কল্পনার ঐশ্বর্য ও জ্ঞানীর ক্ষুরধার বিচারপরায়ণতা এই দুইয়ের এককালীন সমাহার ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে। সুতরাং কেমন করে তিনি প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস অথবা প্রবৃত্তির রক্তশূন্যতার পোষকতা করতে পারেন ? এ যে তাঁর নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ কাজ।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ রামমোহন ও তাঁর পিতৃ-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের একজন উৎসাহী অনুগামী ছিলেন। তিনি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েক বৎসর আদি ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারীও ছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারণের ক্ষেত্র; তার সঙ্গে তাঁর কাব্যের জগৎকে একত্রে মিশিয়ে ফেললে খুবই ভুল করা হবে। ব্রাহ্ম সমাজের একাংশ নীতির শুচিতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করত—এই অভিযোগ যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় তাহলেও ওই সাক্ষ্যের জোরে কবিকে নীতিবাগীশতার কিংবা রুচির খুঁতখুঁতে বাইয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করা চলে না। তা যদি হত তো পূর্বোক্ত কবিতাগুলি তিনি লিখতে পারতেন না কিংবা উত্তর কালের সৃষ্টিশীল জীবনে 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'দুই বোন'' মালঞ্চ' উপন্যাস অথবা 'ল্যাবরেটরীর' মত গল্প তাঁর কলম থেকে বেরোত না। কিংবা তাঁর তুলিকাপাতে খাপছাড়া অত্যদ্ভুত এক রূপের জগৎ উন্মোচিত হতে পারত না অগতানুগতিক রঙ ও রেখাঙ্কনের সহায়ে গঠিত এক বিচিত্র চিত্রশালার মাধ্যমে।

আসলে রবীন্দ্রনাথ না নীতিবাদী, না প্রবৃত্তির উচ্ছলতার পক্ষপাতী। তিনি শান্ত-সুন্দরের উপাসক। সুনীতির প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন কিন্তু সুরুচির মূল্যে নয়। জীবনের বাস্তব অর্থাৎ জীবনের সত্যকে তিনি প্রভূত গুরুত্ব দেন কিন্তু সৌন্দর্যের বিনিময়ে নয়। সত্যের রুক্ষ রূঢ় পরুষ মূর্তি তিনি সৌন্দর্যের মোহন প্রলেপ দ্বারা কমনীয় ও মোলায়েম করে আনবার পক্ষপাতী। এই ক্ষেত্রে কীটসের কাব্যাদর্শ '(ট্রুথ বিউটি, বিউটি ট্রুথ') আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ এক বিন্দুতে এসে মিলে গেছে। অর্থাৎ সত্যের অপহ্নব ঘটিয়ে তিনি সৌন্দর্যের পোষকতা করেন না, আবার সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়ে তিনি সত্যের পশ্চাদ্ধাবন করেন না। কবির শিল্পদৃষ্টিতে সৌন্দর্য ও সত্য 'হরি-হর মিলি হইল এক'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সমন্বয়মূলক শিল্পদৃষ্টিকেই 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' প্রভৃতি বইতে বিস্তার করে বুঝিয়েছেন। কবির অনবদ্য ভাষা ও ভাবের লাবণ্য সাহিত্যের তত্ত্ব আর তত্ত্বের কঙ্কালমাত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা হয়ে উঠেছে অনবদ্য রূপরঙের এক উজ্জ্বল শরীরী-প্রতিমা। কবির সাহিত্য সমালোচনার পরতে পরতে রস, বাঁকে বাঁকে সৃষ্টির স্বাদ। তার প্রত্যেকটি নিজেই এক সৃষ্টি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সুস্থ সংস্কৃতির পরিপোষক ছিলেন বলা মানেই তিনি সমন্বয় তত্ত্বের সাধক ছিলেন। অর্থাৎ সুন্দরের সঙ্গে শিবের অন্বয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন। একদিকে ভাবের অসংযম অন্যদিকে ভাবের বন্ধ্যাত্বের তিনি প্রতিবাদী ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, তাঁর পক্ষপাত ছিল মধ্যপন্থার দিকে, যার অন্য নাম 'সুবর্ণ মধ্যম' ('গোল্ডেন মীন') অ্যারিস্টটল-কথিত এই সোনালী মধ্যযানের মূল কথাই হলো উদারতা। উদারতা চিন্তায়, কর্মে রচনায়। এটা একটা 'অ্যাটিচ্যুড', জীবনকে দেখবার একটা বিশেষ রূপ। এই ভঙ্গিতে অতিরেককেও সমর্থন করা হয় না আবার অতিরেক বা আতিশয্যের মধ্যে শক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকেও স্বীকার করে নেবার মত উদারতা দেখা যায়। এক পরম প্রসন্নতা ও সহিষ্ণুতায় জীবনকে গ্রহণ করবার মানসিকতা এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। সহানুভূতি এমনতর সহিষ্ণুতার হাত ধরাধরি করে চলে। ক্ষমা প্রায়ই সহানুভূতির সহযাত্রী হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই পরম-উদার ক্ষমাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পাওয়া যায় কল্লোল যুগের তরুণ

(শেষাংশ ১০০৪ পৃষ্ঠায়)

বাংলার নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ

অরবিন্দ পোদ্দার

"ফুল যখন ফোটে চারিদিকের হাওয়ায় সে সংবাদ পাওয়া যায়", বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তেমনি, সামাজিক পটভূমির আবহাওয়ার সংবাদেও মহৎ আবির্ভাবের আভাস ছড়ানো থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশও ঐ আবির্ভাবের জন্য জমি কর্ষণ করেছিল। আর, সে আবির্ভাব শুধুই মহৎ সাহিত্যের নয়, মহৎ জাগরণের।

সেই জাগরণের সূত্রপাত কিন্তু অনেক আগেই হয়েছিল, যেদিন ইংরেজের ভারতবিজয় ভারতবর্ষের গ্রামীণ সভ্যতার নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়েছিল, এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দুটি পরস্পরবিরোধী সভ্যতার সংঘাত থেকে এক অভূতপূর্ব আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। স্তব্ধতায় এসেছিল আকস্মিক গতি, আর ঐ গতির আবর্তনে ভারতবাসী অজ্ঞাতসারেই হয়ে ওঠে বিশ্বাসী। সাংস্কৃতিক সংঘাত যেমন প্রাগ্রসর ইওরোপীয় চিন্তার অধিকার এনে দিয়েছিল, তেমনি ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার মানবিক মূল্যবোধগুলি সম্পর্কেও মানুষকে করেছিল সচেতন। সেই সংঘাতের মর্মবাণীটুকু যাঁরা আত্মস্থ করেছিলেন, তাঁরা যুক্তিবাদী চিন্তা-মননের প্রবর্তন করে, অন্ধ বিশ্বাস ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে সমাজ জীবনে সেই গতির সঞ্চার করতে যত্নবান হয়েছিলেন, যা অচলায়তনকে ভেদ করবে এবং নতুন চিন্তায় শক্তিশালী হয়ে বিশ্বকে বরণ করবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার সেই রকম একজন পথিকের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, সমগ্র মানবজাতি এক বিশাল পরিবার, বিভিন্ন জাতি-উপজাতি এই পরিবারের শাখাপ্রশাখা মাত্র। মানবজাতি এক এবং অবিভাজ্য—এই চিন্তার উত্তরাধিকার শতাব্দীর শেষ দিকে পুনরায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল। রবীন্দ্রনাথ যখন জাতীয় জীবনের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সুগভীর চিন্তার ফসল ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, তখন ইংরেজ শাসনের প্রগতিশীল ভূমিকা যতটুকু ছিল তাও নিঃশেষিত হয়ে গেছে বহুকাল। ইতিমধ্যেই জাতীয়তাবাদে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দল ক্ষুব্ধ, আহত। ব্যবহারিক দিক থেকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নিকট উপেক্ষিত হয়ে সেই উপেক্ষাই তাঁরা ইংরেজকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন শক্তির, প্রয়োজন আশ্রয়ের। সেই শক্তির সন্ধানে তাঁরা অতীত ঐতিহ্যের আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা কাউকে নিয়ে গিয়েছিল পৌরাণিক কাহিনীর বিস্তৃত অঙ্গনে, কেউ বা স্মৃতিশ্রুতিবিশ্বাসে, কেউ বা হিন্দু ধর্মের সনাতনতায়। স্বামী দয়ানন্দের আর্যসমাজ আন্দোলন, শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা, সাহিত্যে পুরাবৃত্তের অতিশয় অভিব্যক্তি—ইত্যাদি বিষয়ের তাৎপর্য পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিমার্গ থেকেই বিচার্য। ঐতিহ্যের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথও স্থিত হতে চেয়েছিলেন, এবং হয়েও ছিলেন;

কিন্তু তাঁর ভুবনবিস্তারী অন্তর্দৃষ্টি এবং মানবিক মূল্যবোধের সম্পদ তাঁকে অন্য কথা বলার শক্তি ও অধিকার দান করে। কালের ফসল হয়েও তিনি কালকে অতিক্রম করে হলেন বিশ্বপথিক।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ঐতিহ্যের আশ্রয় কথাটিকে অবশ্য কোন সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা চলে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনচিত্ত যে মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে ইতিহাসের ধারাকে প্রবাহিত রাখে, সে মাটির আশ্রয় তাঁরও কাম্য ছিল; সেই রসে তিনি স্নাত পরিশুদ্ধ হয়েছিলেন; পুনরায় সেই রসকেই নতুনভাবে সঞ্জীবিত পরিমার্জিত করে তিনি গণজীবনের প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেন। সেই রসে নবীনভাবে উদ্বুদ্ধ জীবন কোন বর্ণ বা জাতির আচারের সীমায় অথবা কোন দেশের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নয়; দেশ-কালের বন্ধন অতিক্রম করে মানববিশ্বে তার উত্তরণ। সেজন্য, তাঁর পক্ষেই পরবর্তী কালে লেখা সম্ভব হয়েছিল,

দলের উপেক্ষিত আমি
মানুষের মিলন ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।...
মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশ-বিদেশের সকল সীমা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাত জোড় করে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের তিলক পরা
সঙ্কীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

আদর্শবাদের আলোকে ও ভাষায় সমৃদ্ধ এই উপলব্ধি কোন সীমাকে স্বীকার করে না; তা আকাশের মতই বিরাট, দেশহীন এবং জাতিহারা।

এই প্রগাঢ় উপলব্ধিই জাতীয় জাগরণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ও অবদানের তাৎপর্য বহন করছে। তৎকালীন নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর ঈষৎ তুলনামূলক আলোচনা করলে তা অধিকতর প্রকট হবে। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজি শিক্ষণগর্বী বুদ্ধিজীবীর দল দেশহিতের নামে বেশ কলরব সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু, তাঁদের স্বদেশ সেবার আয়োজনে দেশ নামক সত্য পদার্থটি যে অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে, এ বোধ তাঁদের চেতনায় উপস্থিত ছিল না। সভা-সমিতিতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যাদির আলোচনায় তাঁদের বাহন ছিল ইংরেজি; কিন্তু, ঐ ভাষা যে দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহমর্মিতা স্থাপনের ভাষা হতে পারে না, এই অতি প্রত্যক্ষ কথাটি আশ্চর্যজনকভাবে তাঁদের উপলব্ধিতে কখনও ধরা পড়েনি। ফলে, দেশাভিমানীর দল আপন ইংরেজি শিক্ষায় সীমায়, বিদেশ কেন্দ্রিক চিন্তার গণ্ডীতে আবদ্ধ রইলেন; জনগণের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হল না।

রবীন্দ্রমানস কিন্তু এ ব্যাপারে পূর্বাপর পরিচ্ছন্ন ও ভাস্বর ছিল; ইংরেজদের নকলে অনুসৃত এই ধরনের স্বদেশীয়ানায় তাঁর কোন আস্থা ছিল না। সেজন্য দেখা যায় ১৮৯৭ সনে নাটোরের রাজনৈতিক সম্মেলনে বাংলা ভাষায় সম্মেলনের সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনি একদল তরুণের পুরোধা হিসেবে আন্দোলন করেছিলেন; সেদিন মনোমোহন ঘোষের মত ইংরেজি দুরস্ত বাগ্মীকেও বাংলায় বক্তৃতা করতে বাধ্য করা হয়েছিল, আর উমেশচন্দ্র বোনার্জীর মত তথাকথিত দেশপ্রেমিককে রবীন্দ্রনাথ ভাল ইংরেজী জানেন না বলে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে দেখা গিয়েছিল। এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ আত্মাভিমানী বুদ্ধিজীবীর দলকে ঘরের পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর কথায়, "মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।" এর তাৎপর্য সম্ভবত এই, যে সাড়া স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছে, তাকে সমস্ত দেশের মধ্যে বিস্তৃত করতে পারলেই তবে দেশের অনুভব শক্তিটা ব্যাপ্ত হবে, সমগ্র দেশ একই অনুভবের সত্যে ঐক্যবদ্ধ হবে।

এভাবে, পরমুখাপেক্ষী না থেকে দেশের মধ্যে, দেশের মানুষের মধ্যে দেশকে আবিষ্কার করা, এবং দেশের প্রতিটি ভৌগোলিক অভিব্যক্তি ও মানবিক অস্তিত্বের সঙ্গে আত্মিক মিলন সাধন করে সত্যিকার দেশপ্রাণতায় উজ্জীবিত হওয়া—এই বিশেষ ক্ষেত্রে, অনুভবের এই বিশাল গভীরতায় রবীন্দ্রনাথই আধুনিক ভারতের শিক্ষাগুরু। ইংরেজিয়ানার গণ্ডী থেকে দেশপ্রেমকে উদ্ধার করে সকলকে এই একান্ত ভাবনায় অনুপ্রাণিত করার জন্য বিপিনচন্দ্র পাল একটি ইংরেজি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসানের লগ্নে তাঁর উদাত্তকণ্ঠের আহ্বান আমরা শুনতে পেয়েছিঃ শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলই বাইরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া ওই পরের দিক হইতে ভ্রূকুটি কুটিল মুখটাকে ফিরাও আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে, তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, নানাদিগভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো; কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো—এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।" আর, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তরুণ ছাত্রদল শহর ছেড়ে গ্রামের কাদামাখা পথে যখন জনসেবায় অগ্রসর হয়েছিল, তখন তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি তাদের তাঁর হৃদয়ের আলিঙ্গন দিয়েছিলেন,

বলেছিলেন গ্রামগুলোকে ব্যবস্থাবদ্ধ করার কথা, শিক্ষা, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রী সম্পর্কে নতুন উদ্যোগের কথা, গ্রামীণ পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর করার কথা আর দেশ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশপ্রেমের এমন ঐকান্তিক আহ্বান আমরা আর কারও কণ্ঠ থেকেই শুনতে পাইনি। অবশ্য, রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ স্বাভাবিক কিন্তু তাঁর আহ্বানের ঐকান্তিকতা সম্পর্কেও কোন প্রশ্ন করা চলে না।

আর, এই ঐকান্তিকতার গৌরবেই তাঁর ন্যাশনালিজমের আদর্শ ঊনবিংশ শতকীয় জাতীয়তাবাদী কলরব থেকে স্বতন্ত্র। ন্যাশনালিজমের যে প্রকাশ তিনি ইউরোপীয় রাজনীতির অঙ্গনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাতে মানবিক শ্রেয়স সম্পর্কে তিনি এতটা বিচলিত বোধ করেছিলেন যে, উৎস, প্রেরণা ও প্রকাশের দিক থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তা থেকে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও একে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল, বিশেষ এক অন্ধতা নেশনতন্ত্রের মূলগত ব্যাধি। "মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম······প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও পরস্পরের সমৃদ্ধিতেও পরস্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক।" তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, এই ইউরোপীয় ব্যাধি যদি ভারতবর্ষের হৃদয়কে, তার সংস্কৃতির মর্মস্থলকে এবং তার যুগসঞ্চিত সমাজধর্মের আদর্শকে আক্রমণ করে, তাহলে কোন্ আত্মপরিচয়ের গরিমায় সে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে? তাছাড়া ইউরোপীয় স্বার্থদানবের সঙ্গে সে এঁটে উঠবেই বা কিভাবে? তাঁর ভয় ছিল, মনুষ্যত্বের আদর্শকে না নেশনত্বের গরিমা বিকিয়ে দেয়; স্বাজাত্যবোধের অতিশয়তায় মানুষ আপন মনুষ্যত্বের মৌল দাবি ও প্রত্যয়গুলো না হারিয়ে ফেলে।

গভীর মননশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ উপনীত হয়েছিলেন অন্য এক বৃহত্তর মহত্তর বন্দরে। সেই আদর্শের বন্দরে নেশন বড়ো নয়, সমাজ বড়ো যেখানে নেশনের "মূল প্রবাহ অতিনেশনত্বের দিকে বিশ্ব-নেশনত্বের দিকে" নিয়ত ধাবিত। তিনি দেশের মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে।" মানবিক মিলনের এক সুমহান উপলব্ধি থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ভারতের পবিত্র ভূমিতে বিশ্ব-মানবের এক বিরাট সমস্যার সমাধান সংসাধিত হবে। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে, যে কেহ এসেছে, যে-কেহ আসবে তাদের সকলকে নিয়ে সে পূর্ণ হবে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মানুষ বর্ণে, ধর্মে, ভাষায়, স্বভাবে, আচরণে বিচিত্র—এই বিচিত্রকে নিয়েই মানবিক বিশ্ব গঠিত। সেই বিচিত্রকে ভারতের মাটিতে একাঙ্গ করে উপলব্ধি করতে হবে। ভারতভূমি বিশ্বভূমি, সব দেশের সব মানুষ সমভাবে এখানে আশ্রিত থাকার অধিকারী—হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে অস্তিত্বশীল থেকে, যে ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীনতা অর্জনের ধারেকাছেও পৌঁছায়নি, এ কথা উচ্চারণ করার ঐশ্বর্যশীল দুঃসাহসিকতা বিস্ময়কর। সম্ভবত, রবীন্দ্রমানসে অনুচ্চারিত এই অনুভবটিও স্থানলাভ করেছিল যে, তিনি যে বিশ্বদৃষ্টির অপরিমেয়তা দিয়ে স্বদেশকে উপলব্ধি করছেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষও যদি তেমনিভাবে আপন আপন দেশের বৃহত্তর পরিচয় গ্রহণ করে তাহলে স্বাজাত্যবোধের অতি-শয়তা থেকে তারা অনায়াসেই মুক্ত হতে পারবে। কারণ, ন্যাশনালিজমের গভীরতার মধ্যে অথবা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নয়, সীমা পার হয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সামঞ্জস্যের মধ্যেই বিশ্বমানবের মুক্তি। ভারতের জাতীয়তাবাদকে তিনি এমনিভাবে বিশ্বজাতীয়তার পথ ধরিয়ে দেন।

বলা বাহুল্য, বিগত শতকের শেষ পাদের উগ্র কলরব মুখরতায় এই আদর্শ ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। কিন্তু, সেই অভাবনীয় বাণীই কবির কণ্ঠ থেকে ছাড়া পেয়েছিল সত্যের অমোঘ মর্যাদা নিয়ে। সেজন্য তাঁকে কম কটূক্তি শুনতে হয়নি। অথবা কম অবজ্ঞা ও অশালীন নিন্দা। ঐতিহাসিক কাল অবশ্য তার শ্রেয়সের পরিপূর্ণ অধিকার সকল মানুষকে দেয় না, রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিল। তাই, তৎকালেই শুধু কেন, এখন পর্যন্তও তিনি আমাদের সমস্ত কর্ম, ভাব, আদর্শ বা সাহিত্যানুশীলণ ইত্যাদিতে আমাদের আশ্রয়, আমাদের অনুপ্রেরণা। বলা যায়, তিনি এ যুগেরও অগ্রচারী; কারণ, তিনি মহামানবের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় রোমাঞ্চ প্রত্যক্ষ করেছেন এই পৃথিবীর ঘাসে ঘাসে।

আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা তো রবীন্দ্রমানসের আজীবন বৈশিষ্ট্য। সেই ১৮৮১ সনে 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ "চীনে মরণের ব্যবসায়" থেকে শুরু করে মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে রচিত "সভ্যতার সংকট" পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়েই আমরা তাঁকে দেখছি আবেগতপ্ত ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে। ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টিশীল জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু, ঐ সভ্যতার আগ্রাসী রাজনৈতিক অভিব্যক্তি, সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদ, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে বল্গাহীন অত্যাচার নিপীড়ন হত্যার তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। তাঁর আপন দেশ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের ভেতর দিয়ে কীভাবে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটছে, ভারতবাসী ন্যায়-সঙ্গত অধিকারাদি হারিয়ে কীভাবে পঙ্গু অস্তিত্বের বোঝা বহন করে চলেছে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়-সামাজিক জীবন থেকে শুভ-বুদ্ধির প্রেরণা কিভাবে দিনের পর দিন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে তিনি তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এবং মানবিক বিশ্ববোধ থেকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন। চিরজীবনের সঞ্চিত

ক্ষোভ ঘৃণা আর আবেগ "কালান্তর" প্রবন্ধটিতে বাঁধভাঙা দুর্বার শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে: "ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হোলো চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয়নি ...ওদিকে আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতবর্ণ নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করার জন্যে ভিড় করে আসে।"

এ ছাড়াও তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার লোভ কি করে "মায়া" জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করেছে, পারস্যের টুঁটি চেপে ধরেছিল, ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করেছেন ঐ প্রবন্ধে; এবং বলেছেন, "এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে" "এমন ভীষণ উগ্র মূর্তিতে" পৃথিবীর দূরদূরান্তরের শ্যামলতাকে দগ্ধ করে দিয়ে আর কখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ উত্তরোত্তর যে মূর্তি ধারণ করছিল, তাকে তিনি অভিসম্পাত দিয়েছিলেন এই ভাষায়, "কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত", বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়; এইতো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবু তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারিনে, দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা, বলতে পারিনে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়।"

পুনরায় স্মরণ করি, শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয়, ইউরোপীয়, এশীয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদের উন্মত্ত দানবিকতার বিরুদ্ধে: তাঁর কণ্ঠস্বর সর্বদাই সোচ্চার ছিল। অন্তরের অপরিমেয় তেজ, :শক্তি ও শুভবুদ্ধিতে বলশালী হয়ে তিনি ঐ অশুভ শক্তিগুলিকে অভিশাপ দিয়ে গেছেন, এবং ভারতের জনসাধারণের সংগ্রামশীল ঐতিহ্য ও মানবধর্মী প্রত্যয়কে আদর্শের এক সুউচ্চ শিখরে স্থাপন করে গেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর "আফ্রিকা" কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যাক; ইওরোপীয় "সভ্যের বর্বর লোভ" ঐ মহাদেশে যে কালিমাময় ইতিহাস রচনা করেছে, কবি সমগ্র মানব সভ্যতার হয়ে সেই "মানহারা মানবীর" নিকট ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলেছেন। এবং আরও পরে: দানবের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য যারা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছিল, তাদের সকলকে ব্যাকুল কণ্ঠে আহ্বান জানানোর কথাও আবার স্মরণে আনা যাক। তাহলেই ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে রবীন্দ্রনাথের অবদানের চিত্রটি পূর্ণ হবে।

সেই আদর্শের উত্তরাধিকার আমাদের, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের। মানুষকে উন্নততর সাংস্কৃতিক পরিবেশের অধিকার দান করা এবং মুক্তির আনন্দে মহিমময় করার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে আজীবন সাধনা তাতে মোহমুগ্ধ অন্ধ বৈশ্যতার বিরুদ্ধে নিদ্রাহীন সংগ্রাম যেমন সত্য, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামও ক্লান্তিহীন। মানবিক বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে মানুষের উত্তরণকে যদি সম্ভাবনাযুক্ত করতে হয়, তাহলে পথের এই দুর্দৈবগুলোকে জয় ও অতিক্রম করতেই হবে। দেশের সর্বস্তরের সকল মানুষকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, আজ ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে আত্মক্ষয়ী কলহে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় নেই, তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য ভিক্ষুকের মত কাড়াকাড়ি করার দিনও আজ নয়, মিথ্যা অহংকারে গৃহকোণের অন্ধকারে আত্মবিস্মৃত অস্তিত্ব বহন করার সময়ও আর নেই, আমাদের ব্যর্থতার লজ্জা থেকে চিরকালের মত বাঁচার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়ী মহৎ মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান আমাদের অবিনশ্বর জাতীয় সম্পদ; আর সেই আহ্বানে মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রামে সাড়া দেওয়াই উপযুক্ত প্রাণশক্তির লক্ষণ।

ব্রিটিশের বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশীয় সমাজের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। এক সময়ে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু বেশী দিন তিনি এই দাসত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকেন নি। স্বাধীনভাবে নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বন করে তিনি প্রচুর ধন উপার্জন করেন। সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ মহলে দ্বারকানাথের প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। দেশের তদানীন্তন অবস্থায় রাজা রামমোহনের মতই তিনি ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থক তবে এই ব্যবস্থাই যে চিরস্থায়ী হবে এটা তিনিও চান নি, রামমোহনও চাইতেন না। ভারতবাসী যাতে ভবিষ্যতে আত্ম-কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে তার জন্য যে দীর্ঘ প্রস্তুতি প্রয়োজন সেই প্রস্তুতির ক্ষেত্র নির্মাণই ছিল রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি দেশনায়কদের লক্ষ্য। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দ্বারকানাথ ছিলেন অন্যতম সৈনিক। দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষাকে রূপদানের জন্য দ্বারকানাথ প্রচুর অর্থব্যয় করে একাধিক সংবাদপত্র পরিচালনের দায়িত্ব বহন করেছিলেন। জনকল্যাণমূলক প্রতিটি কাজের সঙ্গে সেকালে দ্বারকানাথের নাম জড়িত থাকত। জনকল্যাণে তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ও করেছিলেন। আমাদের দেশে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান Land Holder's Society প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বর। এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন দ্বারকানাথ। এই প্রতিষ্ঠান গঠনের কালে দ্বারকানাথের ইংরেজের উপর আস্থা হ্রাস পেয়েছিল, একদা ইংরেজ-ভক্ত দ্বারকানাথ মনে করতে আরম্ভ করেন যে দেশবাসীর জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি সবই সরকারের অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দয়ার উপর নির্ভরশীল। দ্বারকানাথ দুবার বিলাত যাত্রা করেন। একবার ১৮৪২-এ ও আর একবার ১৮৪৫-এ। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা তাঁর শেষ যাত্রা, সেখানেই ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট অকস্মাৎ তাঁর জীবনাবসান ঘটেছিল।

দ্বারকানাথ ইংলণ্ডে দুবারই প্রচুর সংবর্ধনা লাভ করেন। ভারত-প্রবাসী ইংরেজ সমাজেও তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তীক্ষ্ণধী দ্বারকানাথ ইংরেজের এই সমাদর সত্ত্বেও তাদের সাম্রাজ্য-

বাদী স্বরূপটি চিনতে ভোলেন নি। তিনি বুঝেছিলেন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ব্যতীত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে না এবং আপাতত এই সংগ্রাম হবে রাজনৈতিক পথে। ইতিমধ্যে হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হিন্দুকলেজের ভূতপূর্ব একদল ছাত্র ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবাসীর অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে। দ্বারকানাথ অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির ফলে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই 'ইয়ং বেঙ্গল'দের রাজনৈতিক আন্দোলন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমবার বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজ ব্যয়ে জর্জ টমসন নামে এক ভারত-হিতৈষী উদারপন্থী ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ ও বক্তাকে ভারতে নিয়ে আসেন। দ্বারকানাথের চেষ্টায় এই জর্জ টমসন নব্যবঙ্গের যুব নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন ও এঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনের রণকৌশলগুলি শেখাতে থাকেন অর্থাৎ এদের ট্রেনিং দেওয়ার ভার গ্রহণ করেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ টমসনের নেতৃত্বে 'ইয়ং বেঙ্গল' খ্যাত যুবক দল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' গঠন করেন। ইতিপূর্বে গঠিত 'ল্যান্ডহোল্ডারস্ সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন' প্রধানত জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই স্থাপিত হয়েছিল। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ প্রজার স্বার্থ-রক্ষণ। জর্জ টমসন ও প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন যথাক্রমে এর প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক।

১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের যখন মৃত্যু হয় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ তখন ঊনত্রিশ বছরের যুবক। তিনিও হিন্দু কলেজের ছাত্র, তবে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সঙ্গে তাঁর চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অনেকেই ছিলেন বিদেশী ভাবাপন্ন, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ঘোরতর স্বদেশী। খ্রীস্টান মিশনারীদের দ্বারা দেশীয় মানুষের খ্রীস্টানিকরণের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী, পিতার জীবদ্দশাতেই খ্রীস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবর্তন ইত্যাদি কাজগুলিও দ্বারকানাথের জীবদ্দশায় সম্পন্ন হয়েছিল। দ্বারকানাথ ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা খুব করতেন, তাঁদের ভোজেও আপ্যায়িত করতেন। দেবেন্দ্রনাথ সামাজিক জীবনে ইংরেজদের পরিহার করে চলতেন, কখনও তাঁদের ভোজে আপ্যায়িত করেন নি। সেকালে ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাঁদের প্রশংসা ও অনুগ্রহ লাভ বহু বাঙালী প্রধানের পরম আকাঙ্ক্ষিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ কখনও ইংরেজের অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করেন নি।

কোনও ইংরেজ দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসাসূচক কোনও উক্তি করলে দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করতেন। দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশিয়ানা এত উগ্র ছিল যে কোন বাঙালী তাঁকে ইংরেজি ভাষায় চিঠি লিখলে তিনি তা না পড়েই প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠাতেন।

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নবীকরণ সম্ভাবনার কিছুকাল আগে থেকেই দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝতে পেরেছিলেন যে কোম্পানী শাসন সংযত করা দেশের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজন। ইতিপূর্বে 'ব্রিটিশ' জাতীয়দের বিচার অন্য ভারতীয় প্রজাদের অনুরূপভাবে সম্পন্ন হবে, এইরূপ প্রস্তাবিত আইনটি ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের চক্রান্তে পরিত্যক্ত হয়েছিল, কারণ তাদের মতে এটি 'কালা-কানুন'। এই ঘটনাটি শিক্ষিত দেশবাসীর মনে কোম্পানী-শাসনের সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল। সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বার্থে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ সোসাইটি নামীয় প্রতিষ্ঠান দুটিকে সম্মিলিত করে তদানীন্তন দেশ-নেতাগণ কর্তৃক কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে রাজা রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বে সংগঠিত এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য শাসকবর্গের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছিল। বলা বাহুল্য, তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই আন্দোলন আবেদন নিবেদনের মধ্যেই সীমায়িত ছিল।

আধ্যাত্মিকতার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হওয়ার কারণে দেবেন্দ্র-নাথ ধীরে ধীরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন কিন্তু স্বদেশের হিতচিন্তা তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সুবৃহৎ ঠাকুর পরিবারের গোষ্ঠীপতি দেবেন্দ্রনাথের দেশ-প্রেম ও স্বদেশ হিতৈষণা তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদের জনকরূপে খ্যাত রাজনারায়ণ বসু ও হিন্দুমেলার প্রবর্তক সংগঠক নবগোপাল মিত্র এই দুজনও ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ স্বজন ও সহকর্মী।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ৬ মে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এর কিছু আগেই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেছে, এবং তা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজ সম্বন্ধে যে আস্থা ও শ্রদ্ধার ভাব শিক্ষিত সমাজের মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাতে ফাটল ধরেছিল। বাংলা দেশের নীলবিদ্রোহে, রঙ্গলাল মধুসূদনের কাব্যে, দীনবন্ধুর নাটকে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা স্পৃহার স্ফুরণ তখন দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই বাতাবরণের মধ্যে তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল হিন্দু-মেলা নামে একটি জাতীয় সম্মেলন বা উৎসব প্রবর্তন করেন।

শারীরচর্চা, দেশীয় কৃষি ও পণ্যের উন্নতিসাধন, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করাই ছিল এই মেলা বা সম্মেলনের লক্ষ্য। দেবেন্দ্র-নাথের পুত্রগণ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। সেকালের বাঙালী প্রধানেরাও এই জাতীয় মেলার পৃষ্ঠপোষণায় অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৩ বৎসর কাল এই মেলা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বস্তুত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই হিন্দু-

মেলা তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। আমাদের রাষ্ট্রীয় সাধনায় হিন্দু মেলার ইতিহাস অবশ্য স্মরণীয়।

ঠাকুরবাড়ির যুবকেরাই হিন্দুমেলা অনুষ্ঠানে ছিলেন অগ্রণী, তা ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু ও দেবেন্দ্রনাথের স্নেহধন্য নবগোপাল একরকম ছিলেন ঠাকুর-পরিবারেরই মানুষ। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বালক রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারী কলকাতার পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে বালক রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। জনসাধারণের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই কবিতাটিতে স্বাধীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির সঙ্গে পরাধীন ভারতের বর্তমান দুরবস্থায় নিদারুণ খেদ প্রকাশ পেয়েছে। এই সময় কবির বয়স ১৪ বৎসর পূর্ণ হয়নি, ইংরেজ শাসনরূপ নাগপাশের গ্লানি এই বয়সেই তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন।

পর বৎসর হিন্দুমেলার দশম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'দিল্লী দরবার' নামে আর একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এই বৎসর কিছুদিন পূর্বে লর্ড লিটন বড়লাট রূপে ভারতে এসে একটি দরবার বসান। এই বৎসর দুর্ভিক্ষে বহুলোকের প্রাণ হানি হয় হৃদয়হীন শাসক ইংরেজের আড়ম্বরপূর্ণ দরবারে রাজ-প্রসাদ লোলুপ দেশীয় প্রধানদের যোগদানের বিষয়টিকে ধিক্কার দিয়ে এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল। লর্ড লিটন এদেশে এসে রাজদ্রোহ মূলক কোন রচনা দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলেন, এই জন্য এই কবিতাটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় নি, পরে এই কবিতাটি অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি ঐতিহাসিক নাটকে সংযোজিত হয়েছিল। রাজদ্রোহ আইন এড়াবার জন্য আপত্তিজনক অংশগুলিতে ইংরেজের পরিবর্তে মোগল শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

দেশীয় যুবকদের জাতীয়তাবাদমন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সঞ্জীবনী সভা নামে যে গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি গঠন করেন বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজদের সঙ্গে সেই সভাতেও অংশ গ্রহণ করতেন।

যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথ দু'বার ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করেন। ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে অথবা ইংলণ্ডে সর্বশ্রেণীর ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক উচ্চ ধারণাই গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে এই ইংরেজকে যখন এদেশে শাসকরূপে তিনি দেখলেন তখন তার অন্যমূর্তি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার অধীনস্থ দেশবাসীকে শুধু নির্মমভাবে শোষণই করে না, তার শাসনের নাগপাশ অসহায় মানুষের গলা টিপে ধরে। যৌবন প্রাপ্তির পর পিতার আজ্ঞায় নিজেদের জমিদারী দেখাশুনার ভার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম বংলার অসহায় মানুষের শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন।

১৩০০ বঙ্গাব্দে রচিত সুবিখ্যাত 'এবার ফিরাও মোরে' নামক কবিতায় ম্লান মুখ, নতশির, কষ্ট কিলষ্ট, শ্রান্ত শুষ্ক মূক মানুষের বুক থেকে যারা রক্ত শুষে নিচ্ছে, অন্ন কেড়ে নিচ্ছে, গর্বান্ধ নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছে তাদের প্রতি কবি যে ধিক্কার বর্ষণ করেছেন, সেই ধিক্কারের লক্ষ্য ইংরেজ শাসক একথা কবিতাটিতে পরিস্ফুট হয়ে আছে।

ইংরেজ চরিত্র, ইংরেজের ভারত শাসন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার বহু আগেই রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন যে "ইংরাজ আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সঙ্গে পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল, এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ "জন" পুঙ্গব এই গর্ণটিকে মনে মনে কিছু শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে।" ইংরেজ ও ভারতবাসী, (রবীন্দ্ররচনাবলী (১২) জন্মশতবার্ষিক সং; পৃঃ ৯২৩)। পরবর্তীকালে এই ইংরেজ শাসককুল সম্বন্ধে তিনি লেখেন "ভারত দফ্‌তরখানার বহুকাল ক্রমাগত সংস্কারের অ্যাসিডে কাঁচা বয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে একটি আমলা-সম্প্রদায় আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রজা।...যে বড়ো ইংরেজ ষোলো আনা মানুষ আমাদের ভাগ্যে সে থাকে সমুদ্রের ওপারে, আর এ পাড়ে পাড়ি দিতেই প্রয়োজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো আনা ছাঁটিয়া সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া আসে। ...দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়াছে, ..বহুদীর্ঘকাল ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে। নিরন্তর রুটিনের ঘানি টানিয়া ইহারা বিষয়ীলোকদের পাকা প্রকৃতি পাইয়াছে, সেই প্রকৃতি অসাড়তাকেই বল বলিয়া থাকে। .. ..অক্ষমের সহিত কারবার করিয়া একথা তারা ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, যেমন তারা বর্তমানের মালিক তেমনি তারা ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। 'আমরা এখানে আসিয়াছি' এই কথা বলিয়াই তারা চুপ করেনা, আমরা এখানে থাকিবই এই কথা বলিয়া তারা স্পর্ধা করে" (ছোট ও বড়ো, কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী (১৩), পৃঃ ২৫৫)।

অপর একটি প্রবন্ধে ইংরেজের শোষণ ও শাসনকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

"ইংরাজের ক্রমে বংশবৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে, এবং সভ্যতার উন্নতি সহকারে জীবনের আবশ্যক উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। অতএব ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, মোটা বেতনের ইংরাজ কর্মচারীকে এক্সচেঞ্জের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্য দ্রব্যে মাশুল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতেও যদি অসুবিধা হয় তুলার উপর মাশুল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পাবলিক ওয়ার্কস কিছু খাটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষফণ্ড বায়েজাপ্ত করিয়া কাজ চালাইতে হইবে।" (রাজনীতির দ্বিধা, রাজা প্রজা, রবীন্দ্ররচনাবলী ১২, শতবার্ষিক সং, পৃঃ ৯৪৫)।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মহারাষ্ট্রীয় দেশনেতা বালগঙ্গাধর টিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। এই সময়ে রাজদ্রোহ নিরোধক আইন (Sedition Bill) গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয়। এই বিলটি বিধিবদ্ধ হওয়ার দুইদিন পূর্বে এক বিরাট জনসভায়

রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি, দুর্বলের কোন অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্য মাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছা অনুগ্রহ মাত্র।.....আমরা জেতৃজাতির সহস্র ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই স্বাধীনতা সমুদ্রে (মুদ্রা যন্ত্রের) অন্তরঙ্গ ভাবে তাঁহাদের নিকটবর্তী ছিলাম।......আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই রাজ কার্য চালনার সহিত আমাদের ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়। এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকি নয় কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজ-পদতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি। তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন ব্যর্থ বেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে। ...রাজার প্রতি প্রজার সে ভয় গৌরবের নহে এবং প্রজার প্রতি রাজার সে ভয় ততোধিক শোচনীয়।... দুইশত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানব সম্বন্ধের এই কি অবশেষ! কণ্ঠরোধ, রাজা প্রজা, রবীন্দ্ররচনাবলী ১২, শতবাঃ সং) পৃঃ ৯৬২-৬৩)।

১৮৯৭ এর এপ্রিল মাসে কবি নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করেন। পর বৎসর ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তিনি দেশীয় ভাব দেশীয় ভাষা ও দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আহার বিহারে ইংরেজের অনুকরণ স্পৃহা তথা সাহেবিয়ানার তীব্র নিন্দা করেন। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতের নব নিযুক্ত বড়লাট লর্ড কার্জনের দিল্লী দরবার প্রসঙ্গে তিনি 'অত্যুক্তি' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে ক্ষুধিত দরিদ্র প্রজার অর্থে ব্যয় ও বিলাসপূর্ণ দরবার অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করে কবি লেখেন যে ইংরেজ শাসনে ইচ্ছাপূর্বক ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করে প্রজাগণকে একমাত্র কৃষিকার্যকেই জীবিকা রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

পুনঃ পুনঃ খাজনা বৃদ্ধির ফলে কৃষক সমাজকে ঋণজালে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য করার মত মূলধনও ভারত-বাসীর হাতে রাখা হয় নি, রাজস্বও ইংরেজ বণিকদের মুনাফারূপে দেশের মূলধন সবই ইংরেজ স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। ইতিপূর্বে লর্ড কার্জন একটি সভায় ভারতবাসীদের অত্যুক্তি-প্রিয়তার সমালোচনা করেন। দিল্লীর প্রস্তাবিত দরবারকে রবীন্দ্রনাথ অত্যুক্তিরূপে অভিহিত করেন এবং আলোচ্যপ্র বন্ধটিরও নাম রাখেন অত্যুক্তি (অত্যুক্তি, স্বদেশ, রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিক সং, পৃঃ ১০৭৪-১০৮৫)। এই প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আরও দেখাতে চেয়েছেন যে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের মধ্যে বেদনা ও অপমান ওতপ্রোত হয়ে আছে। প্রাক্-স্বদেশী আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধগুলি লেখেন তার মূল বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষাতে এই যে 'গ্রামে গ্রামে যে সামাজিক স্বরাজ পূর্বে পরিব্যাপ্ত ছিল ইংরেজ শাসন তা বিনষ্ট করেছে। গ্রামে গ্রামে দীঘিতে গেল জল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ তাই তলিয়ে গেল।' ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে-লিখিত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে অবহিত করে দেন যে কে আমাদের রাজা বা শাসক যে বিচার ত্যাগ করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে সত্যভাবে অধিকার করার চেষ্টা করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধি ও কর্মশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে কেমন করে তা বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন (স্বদেশী সমাজ—রবীন্দ্ররচনাবলী ১২, শতবার্ষিক সং,—পৃঃ ৬৮৩—৭০২)।

বিদ্রোহী বাঙালীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য লর্ড কার্জন নেতৃবৃন্দের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর সরকারীভাবে বঙ্গচ্ছেদ কার্যকর করেন। এই উপলক্ষে দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় তা স্বদেশী আন্দোলন রূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম তিন বৎসর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও হোতা। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে ২৫ অগস্ট কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কবি ইংরেজের উপর ভরসা ছেড়ে জাতিকে আত্মশক্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন। অর্থনীতি, শিক্ষা, পঞ্চায়েত দ্বারা বিচার ইত্যাদি সকল ব্যাপারে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে তিনি জাতিকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দেন। এই স্মরণীয় জনসভায় কবি রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গীত হয়। যেদিন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় সেই দিনটি (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫, ৩০ আশ্বিন) রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবানুযায়ী বাংলায় রাখী বন্ধন দিবস রূপে উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন প্রাতঃকালে কবি একটি বিরাট শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করেন। গঙ্গাস্নানের পর পথিপার্শ্বস্থ লোকজনের এবং পরস্পরের হাতে ঐক্যের প্রতীক রাখী পরানো হয়। এই উপলক্ষে বিশেষভাবে কবি রচিত 'বাংলার মাটি বাংলার জল ধন্য হউক ধন্য হউক হে ভগবান' গানটি গীত হয়। ঐদিন অপরাহ্নে একটি জনসভা শেষে কবি আর এক বিরাট শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা কালে বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ রচিত এই গানটি গীত হয়েছিল, "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান,

তুমি কি এমন শক্তিমান,

আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান

তোমাদের এমন অভিমান।"

এই যুগে রচিত তাঁর স্বদেশ ভাবনামূলক সঙ্গীতগুলি দেশবাসীর মধ্যে এক অপূর্ব উম্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে অনেকগুলি ছিল বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজ শাসকের প্রতি তীব্র ধিক্কারমূলক। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে,

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে,
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।"

(শেষাংশ ৯৮৫ পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা

ভবতোষ দত্ত

আমাদের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কী ছিল, আজকের দিনে তার পর্যালোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষে। তখন শিক্ষানীতি স্থির করে দিতেন বিদেশী শাসক। আমাদের স্বদেশীয় মনীষীরা শিক্ষানীতি সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের চিন্তা বাস্তব ক্ষেত্রে স্বভাবতই রূপ পেতে পারে নি। রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ, বাঙালী জাতীয় জাগরণের এই প্রধান পুরুষ ইংরেজশাসক পরিচালিত শিক্ষানীতির থেকে আলাদা ভাবেই চিন্তা করে গিয়েছেন। বস্তুত বাঙালির শিক্ষা সমান্তরাল দুটি রেখায় চলে এসেছে; একটি সরকারী শিক্ষানীতি, আর একটি জাতীয় শিক্ষানীতি। আমাদের দেশের যাঁরা চিন্তানেতা, তাঁরা সংকীর্ণ প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে চিন্তা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এটাই তাঁদের গৌরব।

মেকলের সেই কথাটি আজ সকলেরই জানা—ইংরেজি শিক্ষার ফলে হিন্দুদের আর স্বধর্মে আস্থা থাকবে না। ট্রেভেলিয়ন বলেছিলেন ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে ভারতবাসীরা ইংরেজদের অনুকরণে—এমন কি একাত্ম হয়ে, মধ্যযুগের দুঃসহ স্মৃতিকে ভুলবে। এই ভাবে এক পরাধীন জাতি গড়ে তোলা যাবে। অবশ্য বিদেশীদের মধ্যেই আবার এরকম চিন্তাও ছিল—বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার ফলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগবে। কেউ সেটা ভালো চোখে দেখেছেন, কেউ সেটা ভালো মনে করেন নি। প্রথম অবস্থায় কিন্তু বাঙালি সমাজনেতারাই ইংরেজি শিক্ষা চেয়েছিলেন। তার ফলে স্থাপিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ উচ্চশিক্ষাস্থল। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তন হয়েছিল এই কলেজ থেকেই। রামমোহন রায় প্রমুখ যাঁরা ইংরেজি শিক্ষার চর্চা চেয়েছিলেন, তাঁরা ইংরেজ হয়ে গড়ে ওঠবার জন্যই এই শিক্ষাকে কাম্য মনে করেছিলেন, এ কথা অবশ্যই বলা যায় না। তিনি চেয়েছেন সংস্কার মুক্তি, যুক্তিচিন্তার প্রসার। এই ইংরেজি শিক্ষার ফলেই নবযুগের বাঙালি মনীষীদের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার মহিমা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা ঠিক ইংরেজ হয়ে ওঠবার জন্যই ইংরেজি শিক্ষা চান নি।

অতএব ট্রেভেলিয়ন-মেকলে পরিকল্পিত সরকারী শিক্ষানীতির দুটি তাৎপর্য দেখা গেল। ইস্কুল কলেজে যে শিক্ষা প্রবর্তিত হল, তাই দিয়ে চাকরিজীবী ইংরেজভক্ত বাঙালির যেমন সৃষ্টি হল, তেমনি এই শিক্ষা দিয়েই একটা নতুন আদর্শ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বে বলেছিলেন, এখন আমাদের বহির্বিষয়ক জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। সেই বহির্বিষয়ক জ্ঞান আসবে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি থেকেই। আনন্দমঠের উপসংহারেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, ইংরেজ আমাদের পরম উপকারী—সে এই অর্থেই। ইংরেজ এসেছে বলেই ইংরেজ-প্রবর্তিত জ্ঞান ভাণ্ডারের সাক্ষাৎ পেয়েছি। ইংরেজের অধীন হয়ে থাকার বেদনা, আর ইংরেজের আনা বিদ্যার চর্চা দুটো এক জিনিস নয়। রাজনৈতিক ভাবে ইংরেজের অধীন হয়ে থাকা আমরা চাই না, কিন্তু পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার আমরা চাই। কেন আমরা

পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করব তার উত্তর স্পষ্টভাবে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোন বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূরে আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে, ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মাধ্য প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। এই চেষ্টা যে ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্য-যোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—

একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে। সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাত প্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি। ১

১৮২৪ খৃস্টাব্দে রামমোহন লর্ড আমাহার্স্টকে যে বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক পত্র লিখেছিলেন, ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম-তত্ত্বে যা বলেছিলেন এবং ১৯৩৩-এ রবীন্দ্রনাথ কালান্তরে যা বলেছিলেন এই তিনেরই মর্ম এক। আমাদের শিক্ষানীতিকে সার্বভৌম এবং উদার করে তোলার প্রয়াসই এতে অব্যাহত।

কিন্তু এ চেষ্টা বড়ো সহজ নয়। প্রথমত পাশ্চাত্য শিক্ষা সরকারী শিক্ষানীতির ফলে ইংরেজি ভাষামাধ্যমেই বদ্ধ হয়ে রইল। দ্বিতীয়ত এই শিক্ষা লভ্য হল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে —জনসমাজের মধ্যে তার প্রচার ঘটল না।

প্রথমটির সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক সময়ই ভুল ধারণা হয়ে থাকে। আমরা অনেক সময়ে মনে করি পাশ্চাত্য শিক্ষা, যাকে আমরা বলি আধুনিক শিক্ষা, সেটা ইংরেজি ভাষামাধ্যম ছাড়া সম্ভবই নয়। এর মধ্যে একটু ভুল হচ্ছে এই যে, জ্ঞানের বাহন আর জ্ঞানের বিষয় এক নয়। আমরা এই দুটোকে আলাদা করে ভাবতে পারি না—সে আমাদের শুধু সংস্কার নয়, আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। জ্ঞান বা চিন্তা যদি আমার স্বাভাবিক মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে না ওঠে, তবে সে চিন্তা ঠিক আমার নিজস্ব হয়ে ওঠে না। সে শুধু মুখস্থ করা বিদ্যা মাত্র। এ বিদ্যা দিয়ে অন্যের দাসত্ব করা যায়, চাকরি করা যায়, কিন্তু নিজের জীবনে সহজ সংস্কার বা বিশ্বাসে পরিণত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জ্ঞানের কোনো ভৌগোলিক বা জাতিগত পরিচয় নেই। জ্ঞান সর্বমানবিক। কোনো বিদ্যার পাশ্চাত্যে চর্চা হয়েছে বলে সে বিদ্যা পাশ্চাত্য নয়। সত্যকার বিদ্যা মনের মুক্তি বিধান করে। অতএব পাশ্চাত্যে জাত বিদ্যাকে যদি আমার আপন ভাষায় গ্রহণ করে নিতে পারি' তবেই সে বিদ্যা স্বকীয় হল, নইলে সে থাকল আমার অভ্যাসের বাইরে পোশাকী হয়ে।

এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে জনশিক্ষার সমস্যাও। দেশের কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যদি ইস্কুল-কলেজে ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আধুনিকী বিদ্যাকে অধিগত করতে পারল, সমগ্র দেশের অগণিত লোকের জনসমাজের উপায় কী? সবাইকে সমান ভাবে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব নয়। যদি করা সম্ভবও হয় তথাপি বিদ্যা লাভের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। কেন না বিজাতীয় ভাষায় অধিগত বিদ্যা আপন চেতনায় মিশে যাবার সম্ভাবনা নেই। ঘরের ভাব আর বাইরের পোশাকী ভাবে পার্থক্য থাকবেই। সুতরাং আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যা দেশের সর্বপ্রান্তরে ছড়িয়ে আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ্ মাখিয়া, উল্কি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই; আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার যোগ অল্পই থাকে।২

এই কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ১৮৯২ খৃস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি পড়েছিলেন রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে। পরে এটি প্রকাশিত হয় সাধনা পত্রিকাতে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধটি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন, রবীন্দ্রনাথ তার অংশবিশেষ সাধনার প্রসঙ্গকথা বিভাগে (১২৯৯ চৈত্র) উদ্ধৃত করেন। সেই অংশটি এই—

পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ৩

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূলকথা ছিল, 'শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যস্থাপন'। তৎকালীন সরকারী শিক্ষানীতিতে এই সামঞ্জস্যস্থাপন সম্ভব ছিল না। বিদেশী ভাষাই ছিল প্রধানতম বাধা। বে-সরকারী ভাবে এই চেষ্টা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে সশ্রদ্ধ ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ করেছেন—

---

(১) কালান্তর, ১৯৩৩

(২) শিক্ষার হেরফের, ১২৯৯

(৩) রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী), ১২ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৬১৬।

'য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না, এমন কোনো নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের উল্লেখ থাকার কারণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশকালে ঠিক একই সমস্যার অবতারণা করেছিলেন। ৪ যে-বক্তব্য ইংরেজিতে বিন্যস্ত হয়, সে-বক্তব্য দেশবাসীর মধ্যে কতটুকু প্রবেশ করে? সরকারী শিক্ষাপরিকল্পকরা বোঝাতে চেয়েছিলেন, সমস্ত দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য শিক্ষালয় প্রসারের প্রয়োজন নেই। সমাজের উপরের স্তরের লোকেরা শিক্ষালাভ করলে তাদের সান্নিধ্যে এসে সমাজের সাধারণ মানুষেরাও সেই শিক্ষার ফল ভোগ করবে। এই তত্ত্বের নাম 'ফিলট্রেশন থিয়োরি'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষাস্থল। এর প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল এই কল্পনা। বঙ্কিমচন্দ্র ফিলট্রেশন থিয়োরিকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

'বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না। তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?'

রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই কথা বলেছেন। তিনিও ফিলট্রেশন থিয়োরিকে তীব্র আক্রমণ করে লিখেছেন—

'শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নীচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্যসমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।' ৫

বস্তুত শিক্ষানীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য দুটি, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান এবং এমন শিক্ষা চাই যা বিশ্বমানবমনের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন করে। আপাতদৃষ্টিতে এ দুই বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ আছে মনে হবে। কেননা ভাষামাধ্যম বাংলা হলে বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে যোগ সম্ভব নয় বলেই অনেকের ধারণা।

এর আগে 'শিক্ষার হেরফের' থেকে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। শিক্ষা সম্বন্ধে সেটাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উক্তি। তাতে তিনি মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবেই উত্থাপন করেছিলেন। তারপরে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে। রবীন্দ্রজীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে; স্বদেশে যেমন তাঁর কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের বাইরেও তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হয়েছে; মানবমনীষার উদার ক্ষেত্র তাঁর চোখে পড়েছে কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এ-বিশ্বাস অটুট ছিল যে বাঙালির শিক্ষা বাংলা ভাষাতেই হবে। ১৯১৫ তে 'শিক্ষার বাহন' নামে যে প্রবন্ধটি তিনি লেখেন তাতে বাংলাভাষা শুধু নিম্নতর পর্যায়ে নয়, উচ্চশিক্ষাতেও ব্যবহার করার জন্য প্রবল যুক্তি দেন। অবশ্য ইংরেজিকে তিনি বর্জন করতে বলেন নি—

'বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই, শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি জর্মন শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে একথাও বলা বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীর জন্য বিদার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, একথা কোন মুখে বলা যায়?'৬

কিন্তু বাংলাকে লুপ্ত করে অথবা উপেক্ষা করে অবশ্যই ইংরেজি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পর্যায়ে পর্যন্ত বাংলা ভাষামাধ্যম চলিত হবে, এটাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তিনি বলেন, ভালো করে ইংরেজি শিখতে পারল না, এমন বহু বাঙালি ছেলে আছে। তাদের শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে গোড়াতেই বিনষ্ট করে দেওয়া দেশের শক্তির অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়। তাদের জন্য বাংলাভাষামাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভের একটা রাজপথ খোলা রাখা উচিত। এই জন্যে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব এই যে প্রেপারেটরির পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলে দেওয়া হোক। 'ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না, কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?'

১৯১৫ তে শিক্ষার বাহন লেখার পর 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩) এবং 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণে'ও (১৯৩৬) বাংলা ভাষার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সমানভাবেই ধ্বনিত হয়েছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের শিক্ষাচিন্তা একটা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পরিগ্রহ করে 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের, কল্পনায়। এ এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে যেখানে নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত বাংলাই হবে শিক্ষার বাহন। এ প্রস্তাবে দুঃসাহসিকতা আছে, নানা সমস্যাও জড়িত।

প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা ভাষামাধ্যম নিয়ে যারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের ভবিষ্যৎ কি? এতে কি চাকরি জুটবে? রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নটি নিয়ে ভাবেননি, তার প্রধান

---

(৪) বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা

(৫) শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬

(৬) শিক্ষার বাহন, ১৩২২

কারণ এই যে শিক্ষাকে তিনি যথার্থ শিক্ষা হিসাবেই দেখেছেন। সে-শিক্ষা মনুষ্যত্বের শিক্ষা, চিত্তপ্রসারণের শিক্ষা, জীবিকা আহরণের শিক্ষা নয়। আজকের দিনে শিক্ষার এই মৌলিক উদ্দেশ্যটি লুপ্ত হয়েছে। ইস্কুলের শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। কলেজের শিক্ষাকেও বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দিয়ে শিক্ষার তাৎপর্যকে বিশিষ্ট অর্থে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলতে বুঝেছিলেন চিত্তগঠনের শিক্ষা, মানব ঐক্যের শিক্ষা, সংকীর্ণতামুক্ত উদার চিন্তা-ক্ষমতার শিক্ষা। বস্তুত আমাদের নবযুগের শিক্ষানীতি যাঁরা চিন্তা করে গিয়েছেন, তাঁরা এই ভাবেই চিন্তা করেছেন—ইংরেজ যুগে অন্তত সরকারী শিক্ষানীতি ছিল চাকরিসংস্থানের নীতি, ডেপুটি ইত্যাদি রাজকর্মচারী তৈরি করে তোলার নীতি। সেইজন্যই নিরক্ষরতা দূর করা বা শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি কোনো মনোযোগই সেকালে ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে-শিক্ষার আদর্শ কল্পনা করেছিলেন সে-ও ছিল মনুষ্যত্বের আদর্শ। অবশ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ তিনি নিজের মতানুযায়ী রচনা করেছিলেন। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির চর্চার দ্বারা সমাজের উপযোগী হয়ে ওঠাই মনুষ্যত্বের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ে সমাজের কথাই বিশেষ ভাবে চিন্তা করেছিলেন। তার কারণও ছিল। ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এই সূত্রে মনীষাদৃষ্টিতে তিনি নবযুগের একটি বৃহৎ সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। আধুনিক শিক্ষা চাই। পুঁথি-পাঠশালার শিক্ষা দিয়ে মানুষের নবীন মহিমাকে বরণ করা যাবে না। এই আধুনিক শিক্ষা ইংরেজির মাধ্যমে আয়ত্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনই করতে পারবেন, সমগ্র জনসমাজ আধুনিক শিক্ষার আলোকধারা থেকে বঞ্চিতই থাকবে। প্রাচীন ভারতে যেমন জাতিবিভাগ ছিল, আধুনিক ভারতে তেমনি ইংরেজি-জানা এবং ইংরেজি-না-জানা—এই দুই জাতির সৃষ্টি হতে চলেছে। ইংরেজি-না-জানা সমাজ দেশের নবযুগের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্নই হয়ে থাকবে। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লোকশিক্ষার কথা বলে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও দেশের এই আসন্ন বিপর্যয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলেই বাংলা ভাষার জন্য এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করে গিয়েছেন। মাতৃভাষা ছাড়া জনসমাজকে আলোকিত করবার কোনো উপায়ই নেই। চাকরি পাওয়ার জন্য নয়, চিন্তাকে মোহমুক্ত রাখবার জন্য, দৃষ্টিকে মিথ্যা বিশ্বাস ও বিভ্রম থেকে রক্ষা করবার জন্য। 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরা-জীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে. এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পাবার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা।'

জীবিকা অর্জনের শিক্ষার একমাত্রত্ব মানুষকে বস্তুতই জড়ধর্মী করে ফেলে। পশুজীবনের চেয়ে অধিকতর গৌরব সে পায় না। আসলে সেখানেই মানুষের আত্মিক মৃত্যু। সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যার দ্বারা মানুষ জড় পরিবেশের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপনা করতে পারে, একটি বৃহৎ ভূমিকায় নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। চিত্তের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য কিন্তু 'চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি।' জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভ বলতে রবীন্দ্রনাথ যেমন বুঝেছেন চাকরি, তেমনি ছাত্রদের পক্ষে পরীক্ষাপাশ। পরীক্ষাপাশে ডিগরিলাভ এবং ডিগরিলাভে চাকরি-পাওয়ার সুগমতা। আমাদের লক্ষ্য ওই দিকেই সদানিবদ্ধ, তাই 'চিত্তের ঐশ্বর্য' আমাদের কোনো-দিকেই জন্মে না। আমাদের ত্যাগ নেই, আদর্শ নেই, মানবিক মূল্যবোধ নেই, মুক্তবুদ্ধি নেই, স্বাধীন চিন্তা নেই। জানি রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উদ্যত হয়ে উঠবে, ইস্কুল কলেজের শিক্ষা শেষ করে যখন জীবিকার প্রশ্ন মানুষকে ভাবতেই হবে তখনকার জন্য কী কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই? তার কি কোনো ব্যবস্থা জীবনের প্রথম বিশ বছর থাকবে না?

হয়তো থাকবে। কিন্তু যথার্থ শিক্ষা চিত্তকেই ঐশ্বর্যবান্ করে, যে-শিক্ষাকে কবি অন্তত কোনো মতেই গৌণ করে দেখতে পারেন না। চিত্তের এই ঐশ্বর্য কী রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধে তার ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের আধ্যাত্মিক মহিমার উপরেই সবটুকু জোর দিয়েছেন। জৈব প্রয়োজন মানুষ কিভাবে মেটাবে সেটা অবশ্য তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা নয়। এক সময়ে তিনি ভেবেছেন শিক্ষা মানুষকে যে উদার দৃষ্টি এনে দেবে তার দ্বারা দেশ এবং সমাজকে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য-সাধনের আদর্শ তিনি দিয়েছিলেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে। যা আমরা শিখি যে যেন আমাদের জীবনে সত্য হয়। চিন্তা ও কল্পনাকে যেন আমরা জীবনাচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১১)৭ প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। ছাত্রদের আহ্বান করে তিনি বললেন, আমাদের আশেপাশে যে জীবন্ত সমাজ, পৃথিবী

(৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে পঠিত ভাষণ। মফস্বল থেকে যেসব ছাত্র পরীক্ষা দেবার জন্য কলকাতায় আসত তাদের আহ্বান করে এই সভা আয়োজিত হত।

(শেষাংশ ৯৭৬ পৃষ্ঠায়)

শিশুশিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ

লীলা মজুমদার

বিলেতের আইন সব নাবালককেই অর্থাৎ যাদের ২১ বছরের কম বয়স—ইন্‌ফ্যাণ্ট বলে। ইন্‌ফ্যাণ্ট মানেই শিশু। শিশু-শিক্ষা প্রসঙ্গে শিশু বলতে আমিও সব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝি, যাদের বয়স গড়পড়তা ৫ থেকে ১৬। এই সময়টুকুর মধ্যেই বেশির ভাগ মানুষের শরীর-মনের ভিৎ গাঁথা হয়ে যায়; এর পর যা হয় সে-সব এরি উপর তৈরি হয়। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষার আদর্শটি তাঁর নিজের উদ্ভাবন, এর মধ্যে অনেকখানিই গবেষণামূলক এবং সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। আরেক দলও আছেন, যারা সম্প্রতি নানান্‌ খবরের কাগজে নিজেদের অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শে কোনো খুঁৎ নেই, কিন্তু আজকাল বিশ্বভারতীর শিক্ষা সে আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। আক্ষেপের বিষয় হল যে দুই পক্ষের কেউই প্রকাশ্য ভাবে নিজেদের মতের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি দেখাননি এবং প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ পথের নির্দেশ দেননি।

বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রনাথের শিশু শিক্ষার আদর্শটি নিরূপণ করা এবং বর্তমান ব্যবস্থার দুর্বলতা কোথায় খুঁজে দেখা, বিশ্বভারতীর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিকারের উপায় ঠাওরানো নয়। সুখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ নানান্‌ পত্রে, প্রবন্ধে, উপদেশে, বক্তৃতায়, নিজের আদর্শকে এমন সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন যে তার মধ্যে ভুল বোঝার কোনো সুযোগই নেই। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে কয়েকটি রচনা মনে পড়ে।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাদিবসে, ৭ই পৌষ ১৩০৮, ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে আর ২৭ কার্তিক ১৩০৯ সালে, কার্যসম্পাদক কুঞ্জলাল ঘোষকে আগাগোড়া নিজের হাতে লেখা একটি ২০ পৃষ্ঠা লম্বা চিঠিতে কবি বিদ্যালয়ের আদর্শ, কার্যপ্রণালী আর বিশেষ করে গুরুদের কর্তব্য সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে অসম্পষ্ট বা উহ্য কিছুই নেই।

এই চিঠিটিকে বিদ্যালয়ের প্রথম কন্‌স্টিটিউশন বলা চলে। এগুলি ছাড়াও 'শিক্ষা' নামক গ্রন্থে যে নিবন্ধগুলি গ্রথিত হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ করে 'তপোবন' আর 'আশ্রমের শিক্ষা' এই প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত শিক্ষাই হল ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার শিক্ষা। আশ্রমের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ করে বলছেন, 'হে সৌম্য মানবকগণ', শিশু-ও নয়, বালক-ও নয়, ছোট মানুষ, যাদের বড় হতে শিখতে হবে। কোনো রকম খোকামি তিনি সইতে পারতেন না, না কথায় না ব্যবহারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যকে বড় বেশি সহজ করে দেওয়ারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি বেশি সহজ হওয়ার চাইতে পড়া বরং একটু বেশি শক্ত হক। তাহলে ছেলেরা সে পাঠ আয়ত্ত করবার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তিগুলোকে কাজে লাগাবে। শক্তির বিকাশ হবে। তার মধ্যে গভীর আনন্দ আছে, সে আনন্দ থেকে ওদের বঞ্চিত করলে ওদের ক্ষতি হয়।

পড়া একটু শক্ত হক, কিন্তু ছাত্রদের ওপর কোনো কড়া শাসন, মার ধোর করে ভয়ের উদ্রেক করা, কিংবা বিদ্রূপ টিট্‌কিরি দিয়ে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া ঘোর অন্যায়। ১৯৩১ সালেও শান্তিনিকেতনে এসে আমি দেখেছি অন্যায়কারীকে বিধি-মতে বিচার করে শাস্তি দেয় বিচার-সমিতি। তার সদস্যরা সবাই ছাত্র এবং শাস্তিগুলো বেশ কড়াই হয়।

মারধোর বারণ করলেও রবীন্দ্রনাথ দুর্বলতাকে শিথিলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। প্রথম কার্যসম্পাদককে মনোনয়ন করে তিনি এক খানি চিঠিতে লিখেছিলেন, "বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপদ আসন্ন হইতে পারে। ইহাই অনুভব করিয়া কুঞ্জবাবুর হস্তে ভার সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ভাবুক লোক নহেন, কাজের লোক। সুতরাং ভাবের দিকে ঝোঁক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াকুড়ি করেন—তাহাতে তিনি লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়েন, কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের পক্ষে এরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভব করি। আমার সঙ্গে তাঁহার স্বভাবের ঐক্য নাই। থাকিলে আনন্দ পাইতাম, কাজ পাইতাম না।"

এই কটি কথা থেকেই বোঝা যায় ভাবুক কবির কতখানি বাস্তব বুদ্ধি ছিল ; আর ছিল তীক্ষ্ম মেধা আর দূরদৃষ্টি। এ-সব গুণ না থাকলে ছোটদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিতে হয় না।

গুরুদের তিনি বলেছেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্যই মনুষ্যত্বলাভ—সেই বড় হতে শেখার পুরনো কথা—তারপর বলছেন, "মনুষ্যত্ব-লাভ স্বার্থ নহে, পরমার্থ। ইহা আমাদের পিতামহরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে-শিক্ষা, তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে—সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠাদ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।"

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল সংসারের জন্য সৎসাহসী, বিদ্যাবান, বলিষ্ঠ মানুষ তৈরি করা, সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী নয়। তিনি চাইতেন শহর থেকে দূরে বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মধ্যে মুক্তি পেয়ে ছেলে-মেয়েগুলি সব দিক দিয়ে পরি-পূর্ণরূপে বাড়ুক।

বাড়বে, বড় হবে। ছাত্রদের বলছেন "যথার্থ বড় কাকে বলে ?……যে মানুষ কাপড়চোপড় জুতোছাতা নিয়ে নিজেকে বড় মনে করে, ভেবে দেখ দেখি সে কত ছোট !" সেকালের ঋষিরা কিসে বড় ছিলেন, না, "সত্যকে সকলের চেয়ে বড় বলে জানতেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেন নি।……তাঁরা অভয় ছিলেন। ধর্ম ছাড়া আর কিছুকেই ভয় করতেন না।" এখানে 'ধর্ম' বলতে বুঝতে হবে 'ন্যায় কর্ম'।

কি ভাবে ছাত্রদের থাকতে হবে ? না, "সকল প্রকার বড়-মানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে…শরীরকে পবিত্র রাখবে…… যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য।" এ-সব শিক্ষা একটুও সেকেলে নয়, বরং বর্তমান জগতের পক্ষে অতি-মাত্রায় উপযুক্ত। কবি বলছেন ছোটছেলেরা আরাম কেদারায় আরাম করতে চায় না, তারা গাছের ডালে মুক্তি চায়।

নিজের ছোটবেলা বড় বেশি বঞ্চিত ছিল, বড় বেশি বন্দী দশায় কেটেছিল, কিন্তু বহিঃপ্রকৃতি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কেবলি তাঁকে ডাক দিত। বলছেন, "আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতি-প্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্তই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়।…বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।…শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণ-মনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড় মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই।"

নিজের ছেলেমেয়েরা যখন খুব ছোট, যখন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ভালো করে দানা বাঁধেনি, তখন বেশ কিছুদিনের জন্য ছেলেমেয়েদের, তাদের মা ও জনা দুই ইংরেজ শিক্ষক শিক্ষিকা, একজন দেশী পণ্ডিত ইত্যাদির হেপাজতে শিলাইদার কুঠিবাড়িতে রেখে দিয়ে মনের স্বপ্নটাকে বোধ হয় কবি যাচাই করে দেখেছিলেন। কিন্তু নিঃসঙ্গতার কথা মনে

হয়নি। নিজে থাকতেন হয় চিন্তায় ডুবে, নয় কাজে ব্যস্ত; মাঝে মাঝেই দীর্ঘকালের জন্য কলকাতায় বা অন্য কোথাও চলে যেতেন। কাজেই পরীক্ষাটা সফল হয়নি সকলে হাঁপিয়ে উঠেছিল; তারা যে-আনন্দ পাবে ভেবেছিলেন তা কেউ পায়নি। কিছুকাল পরে সবাইকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। ততদিনে মনে শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছিল। বড় মেয়ের বিয়ের অনতিকাল পরেই সেটি কাজে রূপ নিল।

কবি বলছেন, "শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে। সেটা ক্লাস্ নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না।...এই গেল বাহ্যপ্রকৃতি, আর আছে' দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে। ভারত বর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়।" সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বদা তাঁর গভীর আগ্রহ দেখা যেত। ঠাকুরবাড়ির সব ছেলেরা সংস্কৃত শিখত। আগেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। আশ্রমের শিক্ষা বলতে তিনি মান্ধাতার আমলের কোনো আদিম ব্যবস্থা বুঝতেন না, বুঝতেন সেকালের আশ্রম শিক্ষার চিরন্তন আদর্শটিকে। বর্তমান আশ্রম শিক্ষায় সেটিকে রক্ষা করতে হবে। বলছেন, "তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেন না এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতর-কার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।"

সেই সত্যটি তবে কি? কবি বলছেন, "তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ী ভাবে বাঁধা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।"

বারেবারে কবি তাঁর ছাত্রদের কাছে সাদাসিধা কাপড়চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, দৈনন্দিন জীবনে কষ্ট করতে শেখা, এই সবের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গুরুদেব বলেছেন, যতদূর সম্ভব বাইরের উপকরণ লাঘব করতে। সেকালের মহা-ঋষিরা কোন উপকরণ ব্যবহার করতেন? আজকালকার উপকরণসর্বস্ব বাহ্যাড়ম্বরাশ্রয়ী প্রাথমিক শিক্ষার দিনে এসব হয়তো অদ্ভুত শোনাবে। আমরা নিজেরা বিদ্যালয়ে বই পড়া বিদ্যে অনেক লাভ করেছি, মনুষ্যত্বের শিক্ষা প্রায় কিছুই পাইনি। তবু যেটুকু পেয়েছি, এখন তাও উঠে গেছে। কার্যকরী শিক্ষার মধ্যে ন্যাকড়ার টুকরোয় ফুল তোলা আর খাতায় রং তুলি দিয়ে নকশা আঁকা, কিংবা ঐ ধরনের কাজ ছাড়া আর কিছু না। আমাদের শিক্ষা "প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ" কোনদিনও হয়নি। আমাদের পরবর্তী কালেও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। খুব সম্প্রতি অর্থনৈতিক তাগাদায় সত্যিকার কার্যকরী বিদ্যাদানের কথা উঠছে। রবীন্দ্রনাথের এসব কথা প্রায় ৮০ বছর আগেই মনে হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে ডিউটি দিত, বাসন ধুত, পরিবেষণ করত, আশ্রম পরিষ্কার করত, অতিথি এলে তাঁদের আদর-যত্ন করত আর তাদের গুরুদেবের অনুপ্রেরণায় আনন্দের মধ্যে দিয়ে এ-কাজ সম্পন্ন হত। এ সেই "বিলাসমোহমুক্ত প্রাণ-বান আনন্দের মূর্তি।" কাজের মধ্যেই একে পাওয়া যায়।

বাধ্য হয়ে অনেককেই শহরে থাকতে হয়, কিন্তু ছোট ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে হলে, শহর তার উপযুক্ত জায়গা নয়। পাড়া-গাঁয়ে বড় হবার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে গাছপালা, ধানক্ষেত, জন্তুজানোয়ার; সেখানে বিলাসিতার অভাব, কৃত্রিম জীবন-যাত্রার উপায় নেই। ছোট ছেলেরা বিশ্ব-প্রকৃতির অতি কাছের জিনিস। "বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। বয়স্কদের শাসনে যে-পর্যন্ত না তারা অভিভূত হয়েছে সে পর্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা ছটফট করে।......বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহেমনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।"

এর পর আর বলে দিতে হবে না যে রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যে শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেটি সম্পন্ন হবার একমাত্র জায়গা হল শহরের বাইরে। যেখানে শরীর মন দুই শক্তপোক্ত হবে। কবি দুর্বলতা ভালোবাসতেন না। উপকরণবহুল খেলা-ধুলোরও পক্ষপাতী ছিলেন না। একটি বড় আধুনিক মনোভাব তাঁর মধ্যে কাজ করত। তিনি সাম্যবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একটা আশ্রমের মতো জায়গায় সকলে সমানভাবে না থাকলে, মনুষ্যত্বের শিক্ষায় ফাঁক থেকে যাবে। আজকালকার বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পিত শিক্ষায় মস্তিস্কের উন্নতির প্রচুর ব্যবস্থা, কিন্তু মনুষ্যত্বের স্থান নেই। তবু তাঁরাও বলেন সব ছেলে এক ইউনিফর্ম পরবে, আবাসিক বিদ্যালয়ে সবাই এক রকম খাবে থাকবে। বাড়ি থেকে খাবার আনতে পারবে না কেউ। কবি আরেকটু বেশি বলতেন, কারো খাবার এলে সবার সঙ্গে ভাগ করে খেতে হবে।

এই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার অশেষ গুণ। "মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল।"

এই খুশি কিন্তু খেলার মাঠের কিংবা বিনোদন পর্বের ফূর্তি থেকে একটু আলাদা জিনিস। "আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরু-শিষ্যের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছি।" আরো বলছেন, "দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে... শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ পেয়ে।"

এইখানেই অনুশোচনার শুরু। তাঁর জীবনকালে শিষ্যরা অ-পর্যাপ্ত পরিমাণে এই সঙ্গ পেয়েছিল আর কি সব মানুষ তৈরি হয়েছিল! শুধু তাঁর কাছেই নয়, যে-সব গুরু তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন, তাঁরাও একেকজন একেকটি বিশাল বনস্পতির মতো আশ্রয়, পুষ্টি, শান্তি দিতেন। নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ রায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায়, গোঁসাইজি এবং আরো কতজনে। তাঁরা সকলে বৈষয়িক উন্নতির চিন্তা ছেড়ে, একটি মহান্ আদর্শের জন্য এই শান্তিনিকেতনে দীর্ঘ দিন বা সমস্ত জীবন কাটিয়ে গেছেন। এই যে গুরুর অনুপ্রেরণায় কবি বিশ্বাস করতেন, এঁকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? কবি বলছেন, "আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা।" অর্থাৎ কেবলমাত্র ক্লাসের সময় ছাত্রদের কানে নানান্ তথ্য ঢেলে দিলেই হল না, সারা দিনমান সে শিক্ষা চলতে থাকে, সারা দিনমানে গুরুর ছুটি থাকে না। তাঁর জীবন তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। "সহকারিতার সখ্য বিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতিক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা।...নিজের চারদিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই।" আশ্রমের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ হলে আশ্রমই হবে বিদ্যানিকেতন, আশ্রমই হবে নিবাস। সহজেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ সর্বদা আবাসিক বিদ্যালয়ের কথাই ভেবেছেন। এমন কি পাছে ছাত্রদের উপর বাইরের কোনো অপ্রীতিকর প্রভাব এসে বিঘ্ন ঘটায়, তাই তিনি তাঁর প্রথম কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে চিঠিতে গুরুদের সতর্ক করে দিয়েছেন ছেলেদের সঙ্গে যেকোনো বাইরের লোক নির্বিচারে মিশতে না পারে।

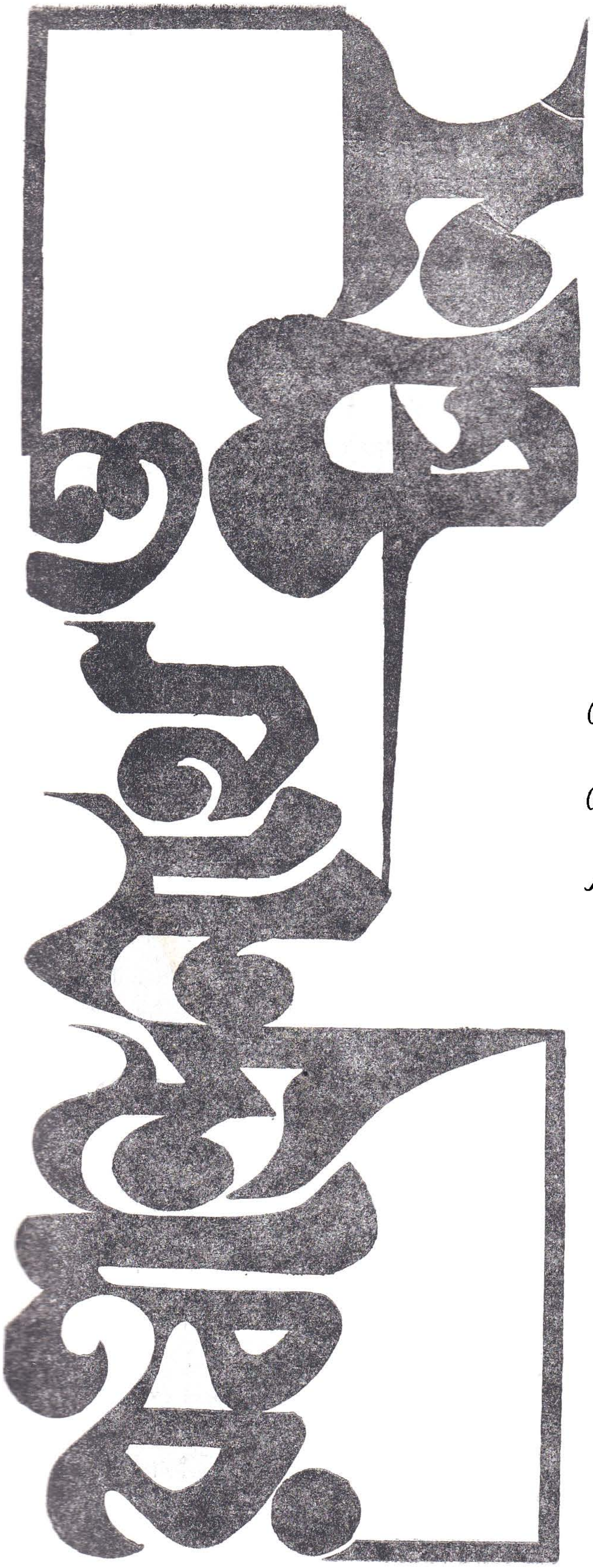
ছোট ছেলের গুরু হওয়া চাট্টিখানিক কথা নয়। "যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনার নাড়ীর যোগ থাকে না।...যিনি জাত শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে।"

কোথায় পাওয়া যাবে এমন গুরু? কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এঁরা তৈরি হন না। কবি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন।...শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না।"

মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিতে হলে নিজেকেও উঁচুদরের মানুষ হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবল ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণায় যে সব উঁচুদরের মানুষকে একদা দেখেছিলাম, তাঁরা কেউ নেই। এখন যাঁরা শান্তিকেতনের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন, তাঁরা কোনো আদর্শের অনুপ্রেরণায় আসেন বলে মনে হয় না, কবির অবর্তমানে সে-রকম আশা করাও উচিত নয়। এঁরা সকলেই উচ্চ-শিক্ষিত গুণী মানুষ, কিন্তু কবি পরিকল্পিত সেই 'গুরু' নন। এঁরা ছাত্রদের ঘণ্টা ধরে বিদ্যা-দান করেন, কিন্তু মনুষ্যত্ব দান করার ক্ষমতা কিংবা প্রয়াস নেই। এঁদের মনোনয়ন করবার সময় সে-সব বাড়তি গুণের কথা ওঠেনি। যে সব ব্যক্তিদের কর্তব্য নির্বাচন করা, তাঁদের মধ্যেও কজনই বা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শের চর্চা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিতেন শিশু-শিক্ষার উপর, বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্ণধাররা গুরুত্ব দেন উচ্চশিক্ষার উপর। অথচ যে ছাত্র ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে এখানে আসে, তাদের মধ্যে অর্ধেকও হয়তো এখানকার বিদ্যালয়ে কিংবা রবীন্দ্রনাথের আদর্শে মানুষ হয়নি। এই সব কারণে কবি-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে একধরনের ব্যর্থতা চোখে পড়ে।

কিন্তু ফল-লাভে ব্যর্থতা দেখা গেলেই, আদর্শের অযোগ্যতা প্রমাণ হয় না। এই জন-শিক্ষার যুগে, যখন দেশের লোকদের শহরের মোহ ঘুচিয়ে, গ্রামের দিকে আকৃষ্ট করার কথা শোনা যাচ্ছে, যখন সামগ্রিক দুর্নীতি ও আলস্যের পরিপ্রেক্ষিতে কবির সেই 'মনুষ্যত্ব দান'-এর প্রয়োজনটি আরো বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে, তখন রবীন্দ্রনাথের শিশু শিক্ষার আদর্শ ও প্রণালী বিষয়ে আরেকবার সচেতন হলে, বৃত্তি দিয়ে শিক্ষকদের বিদেশে পাঠিয়ে নবতম উপকরণের ব্যবহার শিখিয়ে আনার আগ্রহ কমে যেতে পারে। লিখতে পড়তে, হিসেব কষতে শেখানো খুব সহজ, কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভ করা বড়ই কঠিন।

পরিশেষে কবির নিজের মনের আশার কথা বলি,..."সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি। সেই জন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্মের অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মান হইয়া পড়ে না।...ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয়, তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়।" সেই পথেই আমাদের জনগণের শিক্ষার পথ। এবং সে-শিক্ষা আরম্ভ হয় শৈশবে।



মৈত্রেয়ী দেবী

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চীন থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশী তো হয়েছিলামই তবু কিছুটা চিন্তাগ্রস্তও ছিলাম। দেশটাকে বড় অপরিচিত মনে হয়েছিল। আর তখনই মনে পড়েছিল তাঁর কথা যাঁর কাছে এ পৃথিবীর কোনো দেশই অপরিচিত ছিল না—যিনি শুধু কবিতাতেই লেখেন নি—'দেশে দেশে আছে পরমাত্মীয়' সেই আত্মীয়তা সৃষ্টি করতেও পেরেছিলেন।

১৯৩৮ সালে মংপুর দিনগুলি মনে পড়ছিল। তখন চীনের আভ্যন্তরিক অবস্থার ছবিটি বহির্জগতের কাছে কতটা স্পষ্ট ছিল জানিনা, আমার কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন, জাপান চীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গৃহযুদ্ধেরও নতুন নতুন হাঙ্গামা ও অত্যাচারের খবর আসছে—রবীন্দ্রনাথ রেডিওর কাছে চেয়ার নিয়ে কান পেতে থাকতেন। যতদূর মনে পড়ে তখন পেকিং থেকে বলত না বলত "চুংকিং চায়না স্পীকিং"—। রবীন্দ্রনাথ প্রায় হতাশ্বাস ভাবে বলতেন, 'চীনের দুঃখের ইতিহাস যেন শেষ হতে চায় না। কিন্তু করব কী, আমরা নীরব দর্শক। শুভবুদ্ধির মঙ্গল ইচ্ছার তো কোনো মূল্য নেই, কড়ে আঙুলটি তুলে কাউকে সাহায্য করতে পারব না।' রেডিওর কাছে বসে তারপর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত যুদ্ধের খবর শুনতে শুনতে উনি বেদনায় দীর্ণ হতেন। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্ব যাত্রায় বেরুতেন, তিনি যে বিশ্বভারতীতে বিশ্বের মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন, তিনি যে বিশ্ব মৈত্রীর প্রবক্তা সে তাঁর কতখানি অন্তরের সত্য উপলব্ধি।
যখন নিজের শরীর ক্লান্ত ও ভগ্ন, যখন ব্যক্তিগত অনেক সমস্যা আছে তখনও সেগুলিকে অতিক্রম করে ক্রমাগতই তাঁর মন বিশ্বমানবের সঙ্গে সংযুক্ত হত।
এ যুগে তিনিই প্রথম সারা এশিয়ার মানুষকে এক সাংস্কৃতিক ও মানবিক ঐক্য-বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন ও সেজন্য ক্লান্তিহীন ও আনন্দময় চেষ্টা করেছেন। অথচ আশ্চর্য, স্বাধীনতার পর যখন এশীয় সম্মেলন হয় তখন নেহেরু ও তাঁর পার্শ্বচরেরা একবার রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। সমুদ্র যাত্রার নিষেধ অগ্রাহ্য করে গত শতাব্দী থেকে যে সব বিশ্বযাত্রী ভারতের বাহিরে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় অনেকে আছেন কিন্তু বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই দুজন বাঙালীই বোধ হয় বিশ্বের সভায় ভারতের বক্তব্যকে খুব স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে ও অন্যের গ্রহণযোগ্য করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সভ্যতার মহা যজ্ঞে এশিয়ার সংযোগকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা ছিল একক।

জাপানের শিল্পী ও ভাবুক ওকাকুরার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হওয়ায় জাপানের শিল্পরুচি তার সৌন্দর্যবোধ ও চরিত্র

সংযম তাঁর সপ্রশংস দৃষ্টির অভিনন্দন লাভ করেছে বার বার। ইয়োরোপ ও এমেরিকায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জাপানের সৌন্দর্যবোধ ও সংযমের কথা উল্লেখ করেছেন। জাপানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির অনেক প্রমাণ আছে—তাঁর জাপানী বন্ধুও অনেক ছিল! অদ্যাবধি মাদাম টমিকো কোরা জাপানে ঠাকুর সোসাইটি চালনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপান যখন চীনের উপর আক্রমণ করল তখন তার স্বরূপ বুঝতে ও নির্দ্বিধায় তার প্রতি নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করতে তিনি ইতস্তত করেন নি। চীনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যেন জাপানের সূত্র ধরেই ঘনিষ্ঠ হল। উনিশ শ' ষোল সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গর্জনে পৃথিবী বিধ্বস্ত তখন তিনি জাপানে উপস্থিত। যুদ্ধোন্মত্ত জাপানের রূপ তাঁকে আহত করল। বিশেষ করে মিত্রশক্তির সহায় হওয়ার ফলে চীনের উপর তার দাপট ও শোষণ চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। সর্বত্র রণলোলুপতা ও বিজয়োল্লাসের চিহ্ন ছড়ানো—এই দৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশী বিশ্ব-মৈত্রী-ভাবনার দিকে নিয়ে গেল এবং তিনি জাপানকে ভর্ৎসনা করলেন। নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে, বিরূপতার সম্মুখীন হবেন জেনেও তিনি সত্য বাক্য বলতে ইতস্তত করলেন না। সেই সময়ে তিনি যা বলেছিলেন এবং পরবর্তী যুদ্ধেও জাপানী কবি নগুচিকে লেখা তাঁর চিঠিতে যা বলেছেন সমস্ত কথাই জাপানের পক্ষে সার্থক ভবিষ্যৎ বাণী হয়েছিল।

জাপানের এই কু-কীর্তির দৃশ্যে মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধগুলি লিখলেন 'ন্যাশানালিজম' নামে গ্রন্থে তা প্রকাশিত হয়ে বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করে দিল। বইটির নাম ন্যাশানালিজম্ হলেও—ক্ষুদ্র ন্যাশানালিজমের প্রতি ধিক্কার ও ইনটারন্যাশানালিজমের কথাই এখানে আছে—আহ্বান আছে মানুষকে তার ভৌগোলিক ক্ষুদ্র গণ্ডির থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য। যে মঙ্গলে মানুষে মঙ্গল নেই যার অন্য জাতির অমঙ্গল ঘটিয়ে নিজের লাভের চেষ্টা তা মনুষ্যোচিত নয়, এবং তার পরিণতিতে অমঙ্গল।

এই বই বহু লোককে রুষ্ট করলেও জগতের ইতিহাসে কোনো কবির লেখায় এ ধরনের বিবেকবাণী এমনভাবে উচ্চারিত হয় নি। বিশ্বভাবনার অরুণোদয় ঘটল রবীন্দ্রমানসে। যুদ্ধরত মিত্র শক্তি এই বইকে ভালো চোখে দেখে নি বটে তবে সমগ্র রবীন্দ্ররচনায় এর একটি বিশেষ স্থান আছে। জাপানের হাতে চীনের নিপীড়নই এই গ্রন্থের প্রেরণা।

অবশ্য চীনের দুর্দশার কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন আরো অনেক আগে থেকে। থিয়োডোর ক্রিস্টিয়ের নামে কোনো জার্মানের লেখা 'ওপিয়েম ট্রেড' বইখানি কুড়ি বছর বয়সে ইংরেজি থেকে 'চীনে মরণের ব্যবসায়' নামে অনুবাদ করেন—এবং জন চীনাম্যানের চিঠি বইখানিও (যদিও ইংরেজের লেখা) রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ বিচলিত করে এবং একটি দীর্ঘপ্রবন্ধে এশিয়াবাসীর, বিশেষত চীন ও ভারতের দুর্গতি, দুর্বলতা ও শক্তির উৎস সম্বন্ধে ভাবায়।

তারপর ১৯২৪ সালে বন্ধুবৃন্দ সমভিব্যাহারে যখন চীন গেলেন তখন থেকেই চীনের মানুষের সঙ্গে তিনি একাত্ম।

চীনা সংস্কৃতি প্রচারের জন্য শান্তিনিকেতনে চীনাভবন সৃষ্টি তাঁর ও চীনের চিন্তাবিদ্‌দের একটি প্রশংসনীয় যুগ্ম প্রচেষ্টা। চীন দেশের শ্রদ্ধাশীল মানুষের দানে এই ভবন গড়ে উঠেছে। সমগ্র ত্রিপিটক ও অন্যান্য চীনা পুস্তক তাঁরা দান করেছেন। তরুণ অধ্যাপক তান উয়ান্ সান চীনা দেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তারপর চীনাভবনের কাজেই সমগ্র জীবন দান করছেন। আজ তিনি বৃদ্ধ, তাঁর ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশে মানুষ, বাঙালীর সঙ্গে একাত্ম।

সম্প্রতি ডাক্তার কোটনীসের বৃহৎ স্মৃতি মন্দির তৈরী হয়েছে চীন দেশে—তারই উদ্ঘাটন উপলক্ষে গিয়ে তাঁর বিষয়ে নানা কাহিনী শুনলাম। চীনের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদের সহযোগী হয়ে অকালে মারা যান তিনি। মৃত্যু সময়ে তাঁর পুত্রের বয়স মাত্র একমাস। তাঁর চীনা স্ত্রী সেই ছেলের নাম রাখেন ইণ্ডিয়া-চায়না বা ইন্‌হুয়া।

ইনহুয়াও অল্পদিন হয় মারা গেছেন কিন্তু ভারত চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় বেঁচে ছিলেন এবং দুই দেশের মধ্যে এই অমিত্রতার সূচনায় দুঃখ পেয়েছিলেন। একথা শুনে আমার বৃদ্ধ অধ্যাপক শান্তিনিকেতনবাসী 'তান' এর কথা মনে হল। যৌবনে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে এসে তিনি সারা জীবন এখানেই কাটালেন—আমার মনে হল এঁদের সন্তানদেরও 'ইনহুয়া' বলা চলে, তারা জাতিতে চীনা, সংস্কৃতিতে বাঙালী। আরো মনে পড়ল সমস্ত দেশ যখন বিদ্বেষ মুখর তখন শান্তিনিকেতনে কনভোকেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নেহেরু চীনের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের মৈত্রীর কথা উল্লেখ করায় বৃদ্ধ অধ্যাপক তানের চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। দুর্যোগের ঝড়ের মধ্যে এঁরাই আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন।

এবারে চীন ভ্রমণ করতে করতে আমার এসব কথাই মনে পড়ছিল। আমার মনে হচ্ছিল এদের বলি রবীন্দ্রনাথ যে চীন দেশে এসেছিলেন সে কোনো রাজনৈতিক মৈত্রী সফর নয়। রাজনৈতিক প্রীতি বন্ধনের মূল্য আপেক্ষিক, সে সুবিধার সংযোগ। সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয় এবং তখনই তার সমাপ্তি। তখন পঞ্চশীল শিলায় পরিণত হতে বিলম্ব হয় না। রবীন্দ্রনাথের মনে এই সফরের উদ্দেশ্য কি ছিল তা তাঁর

নিজের ভাষাতেই বলা যাক…"মানুষের সম্বন্ধে 'অদ্বৈত' বুদ্ধি অর্থাৎ অখণ্ড মৈত্রী প্রচার করবার জন্য সেদিনকার বুদ্ধভক্ত ভারত থেকে প্রানান্ত দুঃখ স্বীকার করেও দেশ-বিদেশে অভিযান করেছিল, পরস্পরকে আত্মসাৎ করবার জন্য নয়।" এই আদর্শ সামনে রেখেই ভারত ও চীনের সুদীর্ঘ কালের সংযোগে এশিয়ার সভ্যতার বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে। এই চিন্তার ফলেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রেরণায় এশিয়া জুড়ে ভাস্কর্য ও শিল্পের ব্যাপক বিস্তার। চীনের কোনো কোনো স্থানে শ্রেণীবদ্ধ বুদ্ধমূর্তির সামনে দাঁড়ালে মনে হয় ভারতেরই কোনো পুরাকীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। শিল্পে যা এমন প্রত্যক্ষ, মনোজগতেও নিশ্চয় সেই রকম ঐক্য আছে। জীবন দর্শনের সাম্য ঘটেছে সুপ্রাচীন এই দুই দেশের বহুকাল ব্যাপী সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে। সেই ঐক্যের সন্ধানে ভারতাত্মার আবিষ্কারের আদর্শ সামনে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের এশিয়া ভ্রমণ। পরাধীন ভারতে চীন জাপান যবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ সহজ ব্যাপার ছিল না। শাসকবর্গ সন্দিগ্ধ ভ্রূ উত্তোলিত করতেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সন্ধান করাও স্বাভাবিক ছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এর পরোক্ষ যোগ যে ছিল না তা নয়—দীর্ঘদিনের পরাধীনতার গ্লানি দূর করার জন্য, তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য, অতীতের গৌরবময় দিনগুলি স্মরণ করা দরকার ছিল এবং সেই দিনগুলি জড়িয়ে আছে সমগ্র এশিয়ার শিক্ষা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগুলির সঙ্গে। সেযুগে একথা এমনি স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ ভাবেন নি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে চীনের সঙ্গে সংযোগই সবচেয়ে গভীর হয়েছিল এবং শেষ জীবনে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে তাঁর চীনের কথা মনে পড়ত।

অপবাদ যাই রটুক রবীন্দ্রনাথ গজদন্তমিনারবাসী বা পুষ্পবিহারী কবি নন। দেশে দেশে মানুষের সমস্যায়, তার জয়ে পরাজয়ে, রবীন্দ্রনাথ একাত্ম। এর মধ্যে চীন দেশের সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ দরদ পরপীড়িত সেই দেশের মানুষদের ব্যবহার আতিথ্য তথা চীন ভ্রমণেরই ফলশ্রুতি।

প্রসিদ্ধ সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থিত হয়েছিলেন, সেইজন্য চীনে গিয়ে সিংহুয়াতে যাবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল। অনেকে ভাবছিলেন 'কালচারাল রেভলিউশানের' সূত্রপাত ঐখান থেকে হয়েছে বলেই আমার এই আগ্রহ। তা নয়, আমি শুনেছিলাম একদা ২৫শে বৈশাখে তিনি সেখানে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। সেই জন্মদিনে তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল চীনের পোশাক। তাঁর একটি নতুন নামকরণও হয়েছিল 'চু-চেন তান' যার অর্থ হচ্ছে "ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাত"—এটা কোনো উপাধির মত নয় যথার্থই নামকরণ। শুনেছি জীবনের অবস্থা অনুসারে সেদেশে অনেকে নিজের নাম বদল করে। কোনো সময়ে তার কোনো নামটি মানানসই মনে হলে সেই নাম গ্রহণ করে। আমার মনে হয় 'চু চেন তান' নামকরণ সে হিসাবে মানানসই হয়েছিল। এই সমাদরের কথা রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় বারবার মনে করতেন এবং 'জন্মদিন' নামে কাব্যগ্রন্থে এই দিনটির স্মরণে লেখা কবিতাটি প্রসিদ্ধ,

একদা গিয়েছি চীন দেশে।
অচেনা যাহারা, ললাটে দিয়েছে চিহ্ন
'তুমি আমাদের চেনা বলে।'
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ…
…ধরিনু চীনের নাম পরিনু চীনের বেশবাস
একথা বুঝিনু মনে, যেখানেই বন্ধু পাই
সেখানেই নবজন্ম ঘটে
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।

পৃথিবী থেকে চির বিদায়ের আগে যে দুটি দেশ রণ ধর্ষণে বিপর্যস্ত হচ্ছিল যারা অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত স্বভাবতই সে দুটি দেশের কথা তাঁর মন জুড়ে থাকত সে হচ্ছে সোভিয়েট ও চীন। হিটলারের বিজয়ী সৈন্যের রণদর্পের কাহিনী তাঁকে বিচলিত করলেও অশুভ শক্তির শেষ জয়ে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। রাশিয়া যে পরাজিত হবে না এ যেমন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী তেমনি হংকং-এ নোঙর করা জাপান যাত্রী জাহাজ থেকে চীন মজুরদের দেখে চীনের শক্তি সম্বন্ধে তাঁর কল্পনাও তেমনি ভবিষ্যদ্বাণী। অনাবৃত দেহ চীনা মজুরদের মাল বওয়া দেখে লিখছেন, 'কাজের শক্তি কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে মানুষ পূর্ণ পরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্য বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। যে সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোল আনা ব্যবহার করবার শক্তি পায় তার কৃপণতা ঘুচে যায় নিজেকে নিজে কোন অংশে ফাঁকি দেয় না সে যে মস্তবড় সাধনা……চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা তাকে ভয় করছে।……এই এত বড় একটা শক্তি যখন আমাদের আধুনিক কালের বাহনকে পাবে অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে, এমন কোন শক্তি আছে?"…বলতে লজ্জা হচ্ছে অল্প বয়সে যখন এ লেখা পড়ি তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস হয় নি। মনে হয়েছিল কবি কল্পনার রঙে রঙিন করে একটি দৃশ্য দেখছেন। নইলে মুটেদের মাল নামান দেখে এতখানি কি বোঝা যায়? কিন্তু যখন পেকিং শহরের একটি কাটা কাপড়ের দোকানের পাটাতন সরে যেতেই পেকিং-এর নিচে পেকিং দেখতে পেলাম এবং শুনলাম এই ভূতলস্থ শহর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত শ্রমদানে তৈরি হয়েছে তখন আমি দ্রষ্টা

(শেষাংশ ৯৭৭ পৃষ্ঠায়)

(রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ঃ (৯৬৮ পৃষ্ঠার পর)

আছে, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করা, লোকজীবনকে জানা,তাদের ভাষা এবং জীবনযাত্রার পরিচয় নেওয়ার ঔৎসুক্য যদি না জন্মে তার স্কুল-কলেজের শিক্ষা পোশাকী বিদ্যা মাত্র। ১৯০৫-এ যখন দেশে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল, তখন তিনি এই ভাবেই উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে এবার শিক্ষানীতি একটা পোশাকী ড্রয়িংরুম বিলাস না থেকে যথার্থ ভাবেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবে। তিনি বললেন—

'এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধি বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি।' ৮

এবার শিক্ষার একটা জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা করছেন। সে-সময় ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। তখন জাতীয় শিক্ষানীতি-রচনায় আমাদের মনীষীরা ব্যস্ত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ গড়ে তুললেন। এখানেও শিক্ষার মধ্যে উদার আদর্শকে রক্ষা করে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করবার অনুপ্রেরণা আছে। তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা স্বদেশী ঐতিহ্য ইত্যাদি স্বাদেশিক ভাবনায় বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। এটা যুগোচিত চিন্তা কিন্তু এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংকীর্ণতামুক্ত মানবিক আর্দশ বলাধান করেছে। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল যা ভারতীয় ঐতিহ্য তা আর এক দিক দিয়ে বিশ্বজাগতিক। তিনি বলছেন—

'কেউ না মনে করেন, ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটি মাত্র ঋজু রেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বট গাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চার দিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়।'

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই—তার কিছু আগে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ভারতীয় ঋষি যে-তপোবনসাধনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন, আমাদের আধুনিক শিক্ষার্থীও তেমনি ভারতীয় এক বিশিষ্ট পদ্ধতিতেই বিশ্বমানবতাবোধ অর্জন করবে। এখানকার শিক্ষা-পদ্ধতি হল আশ্রমজীবনযাপন, প্রাকৃতিকসান্নিধ্য, উপকরণহীন অনাড়ম্বর সংযম সাধনা। শিক্ষণীয় বিষয় হল আধুনিক—পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শে যা লব্ধ। কিন্তু এই যে শিক্ষাপদ্ধতি—একে নিছক প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার অন্ধ অনুকরণ মনে করলে ভুল হবে। কারণ এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক নিজস্ব শিক্ষাদর্শ ছিল। এখানে তিনি প্রচলিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ না করে এক নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যে-ত্রুটি তিনি অন্যত্র দেখেছেন, যার পীড়নের ফলে একদিন তাঁকে কলকাতার ইস্কুল-পলাতক হতে হয়েছিল, সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত করে এই বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তিনি দেখেছেন, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুমনের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে না, সুকুমার বৃত্তিগুলি পুষ্ট হয় না, পুঁথির পঠিত বিষয় পরীক্ষার জন্য মুখস্থ হয়ে থাকে—সহজ বিশ্বাসে সাবলীল হয়ে ওঠে না, শেষ পর্যন্ত এক তিক্ত অভিজ্ঞতা শিশুর মনের সব আনন্দকেই হরণ করে। শান্তিনিকেতনে তিনি করলেন এক আনন্দযজ্ঞশালার আয়োজন। হৃদয়হীন নিয়ম-বন্ধনকে শিথিল করে দিলেন। ঋতু-বৈচিত্র্যের পটভূমিতে শিশুজীবন স্থাপিত হল, পাখি ফুল গাছপালার অক্লেশ বিকাশ শিশুচিত্তকে মথিত করল। কবি তাদের জন্য গান রচনা করলেন, ঋতুবন্দনা শিখিয়ে দিলেন, বর্ষা-বসন্তের উৎসব আয়োজন করলেন। খেলায় গানে অভিনয়ে উৎসবে আশ্রম-জীবন মুখর হয়ে উঠল। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দকে মিলিয়ে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য।

এক সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন আমাদের পক্ষে এটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। অক্সফোর্ড লণ্ডনের বিদ্যাপীঠ য়ুরোপের বহুকালের নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠেছে। তেমনি আমা-দের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব প্রাণ-প্রকৃতিতে সঞ্জীবিত হয়েছিল নালন্দা বিক্রমশিলার মহাবিদ্যাপীঠ। আমাদের একালের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি সেই ধারায় গড়ে ওঠে নি। বাহিরের দানের থেকে আমাদের দেশে যে-য়ুনিভার্সিটির পত্তন হল তার সঙ্গে দেশের মনের সম্মিলন যেমন ঘটে নি, তেমনি য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে সচল হয়ে ওঠে নি। 'যে সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে।৯

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করেছিলেন এই দুই বিজাতীয়তা পরিহার করবার জন্যই। বিশ্বভারতীর এক নিজস্ব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করে তুলতে চেয়েছিলেন। একদিকে ভারতীয় প্রকৃতির সহজ রূপ আর একদিকে আধুনিক বিদ্যার সচল প্রবাহ—এই দুই মিলেই বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার পরিণত রূপ। বিশ্ববিদ্যার প্রাঙ্গণ রচিত হল বিশ্বভারতীতে। এই তীর্থক্ষেত্রে মিলিত হবে বিশ্বমানবমনের বিচিত্র চিন্তার ধারা। এই শিক্ষা ক্ষেত্রে মানুষ মোহমুক্ত চিন্তার সাধনা করবে। এখানে কোনো জাতি ধর্ম সমাজের বাধা থাকবে না। তিনি বলেছেন—

---

(৮) 'জাতীয় বিদ্যালয়' ১৩১৩, কলিকাতা টাউনহলে পঠিত।

(৯) 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' ১৯৩৩, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পঠিত।

'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলন-নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়-লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।'১০

এই সত্যকে উপলব্ধি করাই রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার শেষ লক্ষ্য। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি শিক্ষা নিয়ে নানা উপলক্ষে নানাভাবে কথাই বলেছেন। মানুষ শিক্ষার দ্বারা সত্যকে লাভ করবে—এটাই তাঁর পরিণত উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্বের মনন-প্রকৃতি যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁর মতে সত্য কি। সত্য হচ্ছে অখণ্ডতা-বোধে। মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে জাতিতে ধর্মে চিহ্নিত করায় সত্য নেই। অসহযোগে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল সহযোগিতায় এবং ঐক্যে। জ্ঞান হচ্ছে ঐক্যসাধক। বিদ্যা হচ্ছে মিলনসূত্র। বিদ্যার ভৌগোলিক রূপ নেই। শিক্ষা মানুষকে সেই বিদ্যারই অধিকারী করবে। রাজনীতি হোক ধর্মনীতি হোক সমাজনীতি হোক সব নীতির ঊর্ধ্বে যে বিশ্বনীতি তাকে জানবার প্রয়াসেই মানুষের শিক্ষার পূর্ণতা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন আছে বিশ্বনীতি, তেমনি আছে রসের ক্ষেত্রে, তেমনি আছে হৃদয়ের ক্ষেত্রে। মানুষের বুদ্ধি মানুষের হৃদয় সেই ঐক্যেরই সাধনা করে চলেছে। সেই সঙ্গে সতর্ক করে কবি বলছেন—

'মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।'১১

এই ঐক্যতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়াই শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য।

---

(১০) 'শিক্ষার মিলন' ১৯২১
(১১) 'শিক্ষার মিলন' ১৯২১

(রবীন্দ্রনাথ ও চীন ঃ ৯৭৫ পৃষ্ঠার পর)

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করলাম। দ্রষ্টা বা ক্রান্তদর্শী তিনিই যিনি সামান্য সূচনাতেই বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পান। সমবেদনা ও ভালোবাসা থাকলে এই দেখা সহজ হয়। চীনে ভ্রমণকালে তাঁদের কাছে এসব কথা বলবার ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু সুবিধা হল না আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। চীনারাও মনে হল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। একজন শুধু আমাকে বলেছিল যে একসময়ে রবীন্দ্রনাথ এ দেশে বহু পঠিত ছিলেন ও অনেকের রচনায় তাঁর প্রভাব পড়েছিল। রবীন্দ্রকাব্য অনুবাদকারিণী এক মহিলার কথা শুনলাম, কিন্তু তার যদিও দেখা হল না। কী কারণে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ সেখানে উহ্য ছিল তা সম্প্রতি বুঝতে পারলাম। গত মাসে যে 'শুভইচ্ছা' সফরে চীনা প্রতিনিধি দল এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন দোভাষী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি আবার চীন দেশে যাব কি না কারণ যদি যাই তবে সে আমার দোভাষী হবে। সুপ্রস্তাব শুনে খুশী হলেও জিজ্ঞাসা করলাম কী কারণে সে এ কথা বলছে তাতে সে বললে, "আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাই—এতদিন বড় অজ্ঞ ছিলাম, জানো তো গ্যাং অফ ফোর স্বাভাবিক পড়াশুনো সব বন্ধ করে দিয়েছিল এমন কি শেক্সপীয়ার পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল।" দলপতি ওয়াং পিং নান আমাকে বললেন ১৯৫০-এর দশকে আট ভল্যুম রবীন্দ্ররচনাবলী অনূদিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে পেকিং-এ মহাসমারোহে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। তার ছবি আমার কাছে আছে। তারপর ১৯৬২ সালে তো ঘটল অশনিসম্পাত। সহস্র সহস্র বৎসরের বন্ধন ছিন্ন হবার উপক্রম।

এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে চীনা জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষ সাক্ষাৎ উল্লেখ করছি। ১৯৪০ সালের শেষ দিকে এই শুভেচ্ছা মিশনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লেখেন তা তত পরিচিত নয় বলে এখানে উদ্ধৃত করলাম।

"সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে, সংবাদে ছিল না মুখরিত,
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে, আজিকার মত এই
প্রাণযাত্রা কল্লোলিত প্রাতে
যাঁরা যাত্রা করেছেন মরণ পঙ্কিল পথে
আত্মার অমৃত অন্ন করিবারে দান দূরবাসী অনাত্মীয়জনে
দলে দলে যাঁরা মরুবায়ুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে
সমুদ্র যাদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীতমহাপ্রাণ মাঝে
শক্তি জোগাইছে যারা অগোচরে চির মানবেরে..."

শুভেচ্ছা দলের নেতা তাই চি তাও রবীন্দ্রনাথকে বলেন "যে সময় চীন ও ভারতে আপনাদের যথার্থ সত্তাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল সেই মুহূর্তে চীন দেশে আপনার আবির্ভাব দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ। ১৯২৪ সনে...আপনি আমাদের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে আমরা পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার মায়া-জাল ছেদন করিয়া নিজেদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ চিনিয়াছি। সেই সময় হইতেই আমাদের প্রস্তুতির নব যুগের সূচনা।'

এই পরম স্বীকৃতি তাঁর জীবিতকালে চীনবাসীর কাছ থেকে শেষ সম্মান।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাস আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে জাতীয়তা অপেক্ষা আন্তর্জাতিকতায় অপেক্ষাকৃত বেশী বিশ্বাসী কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের নানা দেশে ভ্রমণ করেছেন, সে সব দেশের ইতিহাস এবং বর্তমান সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন, সর্বোপরি, তাঁর জীবনের চিন্তা চেতনায় যে সব ঘটনা তরঙ্গ তুলেছে তাদের চিরকাল স্মৃতিতে রেখেছেন। পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে ত তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই পরিচয় ছিল কিন্তু এশিয়ার বিভিন্ন দেশের, বিশেষত চীন, বর্মা এবং মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ঘটে পরবর্তীকালে। চীন দেশ সম্পর্কে কবির গ্রন্থগত জ্ঞান অবশ্য আগে থেকেই ছিল, কিন্তু বতমান শতাব্দীর বি;শর দশকের আগে তা প্রসারিত হবার পথ পায়নি। তারপর হঠাৎই এল চীন ভ্রমণের সুযোগ। 'গেলেন চীনে এবং হিমালয় পরপারের সংকট দীর্ণ এক দেশকে দেখলেন। ফিরে এলেন এবং সঙ্গে নিয়ে এলেন একটি সংস্কৃতি বিশ্বাসী, ঐতিহ্যময় দেশের ছবি। এরপর থেকেই তাঁর বিশ্বভারতীর অঙ্গনে সে দেশের ভাষাসংস্কৃতির ছায়া প্রসারিত হল। চীন দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথা বললেন, লিখলেন। ভারতবাসীও সেই সুযোগে চীন দেশের সঙ্গ পেতে থাকল।

১৯২১-২২ সালেই সিলভ্যাঁ লেভির উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে চীনা ভাষা শিক্ষাদান শুরু হয়। শ্রীমতী হারদুনের প্রত্যক্ষ সাহায্যে চীনা ধর্ম-সাহিত্যের সংগ্রহমালা গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। ১৯২৪-এ কবি যখন চীন পরিভ্রমণ করেন তখন তাঁর সঙ্গী-ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, কালিদাস নাগ, নন্দলাল বসু এলমহার্স্ট। এঁরা শিল্পী সাহিত্যিক—পর্বতপারের দু-দেশের মধ্যে এ এক সেতুবন্ধনের চেষ্টা। এ ভ্রমণের ফলেই দুই অধ্যাপক জোসেপ তুচ্চি এবং ঙ্গো লিম চীনা ভাষা শেখাতে শান্তিনিকেতন আসেন। প্রথমজন ইতালীয় দ্বিতীয়জন চীনবাসী। প্রকৃত ভারত-চীন মৈত্রীর সূচনা ১৯৩৩ সালে। ঐ বছর তান্-য়ুন-সান নামে শান্তিনিকেতন-প্রত্যাগত এক চীনা যুবক স্বদেশে Sino Indian Cultural Society স্থাপন করেন। দেশ থেকে বহু অর্থ সংগ্রহ করে তিনি ভারতবর্ষে পাঠান এবং সেই টাকায় শান্তিনিকেতনে 'চীনাভবন' নির্মিত হয়।

চীনাভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এবং অধ্যাপক তান্ যে ভাষণ দেন তার মধ্যে দু'দেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিগত যে মিল রয়েছে তার উল্লেখ দেখি। কবি দ্বিধা-হীন কণ্ঠে বলেছেন—'চীনের সংস্কৃতি জাতিকে নিঃস্বার্থ ভাল-বাসার প্রেরণা দিয়াছে এবং বিশ্বের কল্যাণসাধনের পথপ্রদর্শন করিয়াছে। এই চীনা সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অপেক্ষা অন্য কোন্ জিনিসের প্রতি মানবচিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইতে পারে?' আর অধ্যাপক তান্ বললেন—'গুরুদেব চীন পরি-দর্শনে যাইয়া চীন-ভারত সম্প্রীতি পুনরুজ্জীবনে যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাঁহার বাণী হইতে আমরা যে প্রেরণালাভ করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই শান্তিনিকেতনে চীনা-ভবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।'

চীনাভবন প্রতিষ্ঠার তিনমাসের মধ্যেই ফ্যাসিস্ট জাপান

চীন ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চীনদেশ আক্রমণ করে। সে সময় কবি অসুস্থ। সংবাদপত্র মারফৎ নিয়মিত ঘটনাপ্রবাহ পড়ে কবি বিচলিত হয়ে থাকেন। দুর্বল চীনের ভূখণ্ডে জাপানীরা ক্রমাগত শক্তি বাড়াতে থাকে। ক্যান্টন হয়ে ওঠে মৃত্যুর শ্মশানপুরী। ভারতের নানা অঞ্চলে এই জান্তব আক্রমণের বিরুদ্ধে 'চীনা-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এ সময়ই আবার কবির কাছে আসে রাসবিহারী বসুর তারবার্তা যাতে ভারতের জাপান বিরোধিতা বন্ধের জন্য অনুরোধ করা হয়। কবি আরও আঘাত পান, তিনি একদিন জাপানকে শ্রদ্ধা করতেন সত্য কিন্তু 'আজ জাপানই অসহায় প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু।' তাই কবি সে সময় (১৭ অক্টোবর ১৯৩৭) লণ্ডনের 'ট্রান্সপোর্ট হাউসে' অনুষ্ঠিত সম্মেলনে Indian Civil Liberties Union' এর পক্ষে যে বাণী পাঠান তা চিরকালের একটি মর্মান্তিক সত্য মাত্র। ঐ বাণীর একজায়গায় লিখেছিলেন—'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রতিদিন তাহার নিজের স্বাধীনতা রক্ষণে সচেতন থাকিতে হয়। কারণ একান্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও প্রজার ঔদাসীন্য বা ভীরুতার জন্য অত্যাচার প্রয়োগের সুযোগ পাইলে আপনা আপনিই অত্যাচারী হইয়া উঠে।' বলাবাহুল্য এই উক্তির সময় চীনদেশের ঘটনাবলীর স্পন্দন কবির মনে ছিল ! তবে কবি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে দেখতেন স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, সত্তরের দশকেও তাঁর সেই উক্তি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কতখানি মর্মান্তিক সত্য হয়ে সাময়িক কালের জন্য দেখা দিয়েছিল।

পরবর্তীকালের গবেষকদের মধ্যে যাঁরা চীন ও ভারত-এর সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করবেন তাঁরা অবশ্যই চীনের বিপ্লবপূর্ব সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের অবদান নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হবেন। ১৯৩৭-র শেষদিকে জাপানীদের পৈশাচিক আক্রমণ যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন কবি শান্তিনিকেতনে গভীর দুঃখে আবেগার্ত। মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে চীনারা যে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করছেন কবি তাতে মুগ্ধ। পৌষ উৎসব অনুষ্ঠানে কবি চীনের নিহত শিশু, নারী এবং নিরপরাধ গ্রামের মানুষদের কথা গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেন। কবি ফ্যাসিস্ট জাপানের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডকেও একই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অভিযুক্ত করেছেন। বৃদ্ধ কবি যে ভাষায় নিন্দা ও প্রতিবাদ সেদিন জানিয়েছিলেন তার মধ্যে ডিউই-আইনস্টাইন-রাসেল-রঁলার অভিমতই প্রতিধ্বনিত। ক'দিন পরেই তিনি চীন সাহায্য তহবিলে মুক্তমনে দান করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান এবং নিজে সেই তহবিলে পাঁচশ টাকা দেন। এখানেই শেষ নয়। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারীতে কবির শরীর যদিও অসুস্থ কিন্তু অর্থসাহায্যের জন্য তিনি 'চণ্ডালিকা' নৃত্য-নাট্যখানিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলেন। ১৮ থেকে ২০ মার্চ কলকাতায় সেটির অভিনয় হয়, অসুস্থ কবি এবং সুভাষচন্দ্রও সে অনুষ্ঠান দেখেন। বলা ভাল, এরপর সুভাষচন্দ্রও চীনা সংগ্রামকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। চীনে মেডিকেল মিশন-এর যাত্রার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা স্মরণীয়।

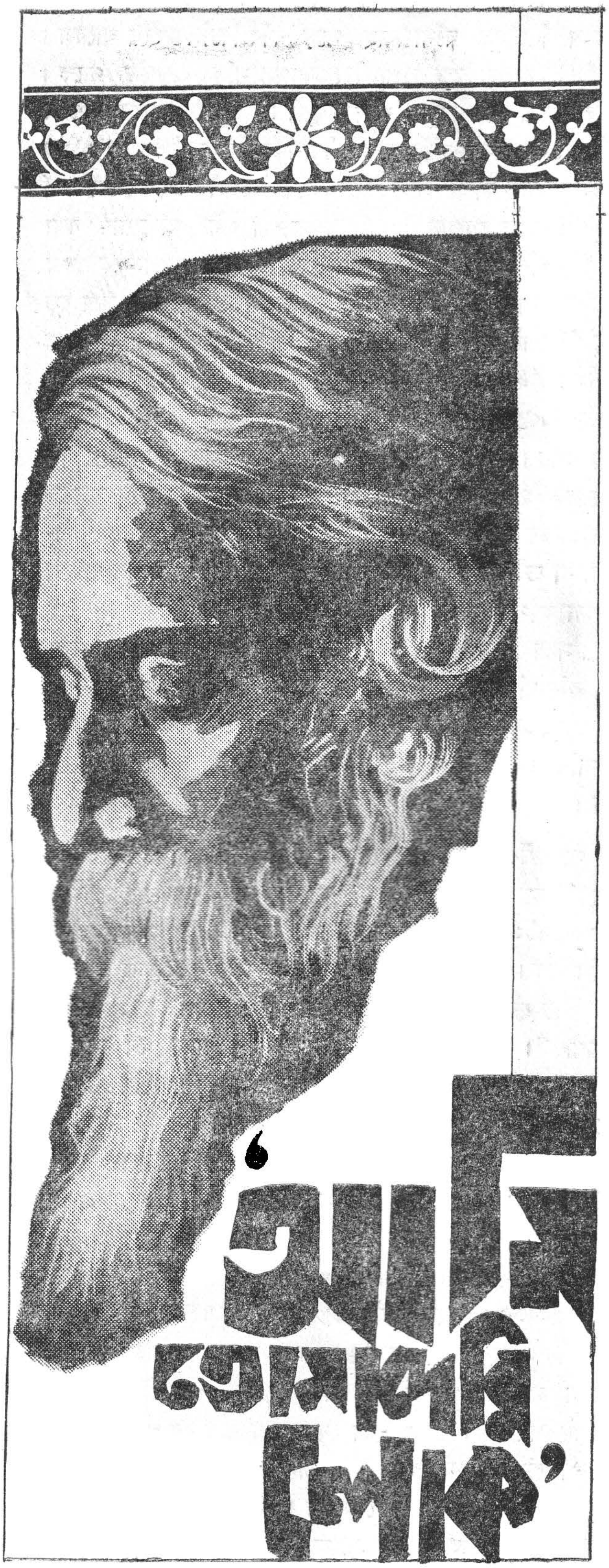
রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি—বিচিত্রের দূত। তাঁর রাজনৈতিক মতামতগুলির জন্মও সেই মানবতাবাদী চিন্তাধারা থেকেই। এই মানবতাবাদের প্রকাশ 'নৈবেদ্য'র কবিতায়, 'কালান্তরে'র প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে এবং রূপক-সাংকেতিক নাটকে নানাভাবে বারংবার প্রকাশিত হয়েছে। চীন ভূখণ্ডে জাপানের অগ্রগতিকে সমর্থন করে জাপানী কবি নোগুচি তাঁকে যে পত্র দেন তাকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করে কবি একটি পত্র পাঠান। ঐ পত্রখানি তাঁর মানবতাবাদী রাজনৈতিক চিন্তাশক্তির চমৎকার উদাহরণ। ঐ পত্র পড়লে বোঝা যায় জাপানের আগ্রাসন নীতি, 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' অভিমতের মধ্যে রাজনৈতিক লুন্ঠনের স্পৃহা, জাপানের মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের অভিমত সেন্সর করা, কূটযুক্তিজালের পিছনে জাগরূক স্বদেশ ভক্তির এক বিকৃত আদর্শ, চীন ও মাঞ্চুকুওতে লোকদের বলপূর্বক নেশায় আসক্ত করে তোলার চক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর দূর-প্রসারী দৃষ্টি সজাগ। কেবল কবির পত্রে একটি আংশিকতা ঘটেছে শুধু চিয়াং-কাই-সেকের নামোল্লেখে—ঐ প্রতিরোধ যুদ্ধে মাও সে-তুঙ এবং চু-তে সমান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

'প্রান্তিক' এবং 'নবজাতক' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতায় প্রত্যক্ষে ও প্রচ্ছন্নে চীনের প্রতি অসীম সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এই সহানুভূতি তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। কবির প্রয়াণের মাত্র আট মাস আগে চীন থেকে ভারতে যে Good Will Mission আসে তার সদস্যরা কবির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা করেন। ঐ মিশনের নেতা তাই-চি তাও অসুস্থ কবির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—'১৯২৪ সালে আপনি যে কেবল ভারতবর্ষের বাণীই চীনে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা নয়, আপনি আমাদিগের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে আমরা পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার মায়াপাশ ছেদন করিয়া নিজেদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ চিনিয়াছি ; সেই সময় হইতেই আমাদের সংস্কৃতির নবযুগের সূচনা।' চীনদেশের তদানীন্তন এই উচ্চ পর্যায়ের নেতার মন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় সে দেশের জনজীবনে রবীন্দ্রনাথের কতখানি পরিচিত ছিল।

গ্রন্থ সাহায্য ঃ—

ক. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড।

খ. নেপাল মজুমদার ঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ৪র্থ খণ্ড।



সরোজমোহন মিত্র

জীবনের গোধূলিলগ্ন যখন সমাগত, বিদায়ের রক্তিমাভা যখন স্পষ্টতর রূপ লাভ করছে, ভাঁটার গভীর টানে যখন জীবনের তরীখানা মহাকাল সমুদ্রের দিকে দ্রুত ভাসমান তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সোচ্চারে আত্মপরিচয়ে বলেছিলেন,

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরি লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়। (পরিচয়, সেঁজুতি)

বহির্বিশ্বেও তখন সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে আসছে। "সমস্ত য়ুরোপ বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত।" প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধীরে ধীরে সংহতি লাভ করছিল ১৯৩৬ সালে এসে তা আক্রমণাত্মক ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় দেখা দিল। ফ্যাসিস্ট ইতালি অতর্কিত আক্রমণে দুর্বল আবিসিনিয়া গ্রাস করে নিল। দর্পোদ্ধত জাপান মুক্তিসংগ্রামরত চীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এসব ঘটনায় মানবমুক্তি ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসী বিশ্ববিবেক ভীষণভাবে আহত এবং বিমূঢ়।

ভারতবর্ষেও নাগরিক অধিকার প্রতি পদে বিপর্যস্ত। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বহুকাল থেকেই বাজেয়াপ্ত, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজি অনুবাদও নিষিদ্ধ হয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদের বই মাত্রই বাজেয়াপ্ত, তিনশতাধিক সংবাদপত্র বন্ধ এবং তাদের জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই উপলব্ধি করছিলেন মৃত্যু কেবল তাঁর জীবনেই দ্রুত ঘনিয়ে আসছে না, মৃত্যু তার সমস্ত মারণযন্ত্র এবং দলবল নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে বহুদিনের বহু মানুষের অক্লান্ত চেষ্টা ও শ্রমে গড়া মানবসভ্যতা ও সমাজের দিকে। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, "এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"

জীবন ও সভ্যতার এক চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই আত্মপরিচয়ের ঘোষণায় স্পষ্ট করে বলে গেলেন "আমি তোমাদেরি লোক।" সমাজ ও সভ্যতা যখন স্পষ্ট দ্বিধাবিভক্ত যেখানে একদিকে আছে "ভাষাহারা" শোষিত, অত্যাচারিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষ আর অন্যদিকে আছে শোষক, অত্যাচারী, উৎপীড়ক মুষ্টিমেয় অর্থগৃধ্নু লোভী গোষ্ঠী সেখানে রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় বলেছেন ঃ

শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে ওঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে

পাণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেসে যাব, বলে যাব 'এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব,' দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

(জন্মদিন)

রবীন্দ্রনাথের এই দৃঢ় প্রত্যয়, সাধারণ মানুষের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস, নির্যাতিত অবহেলিতের প্রতি গভীর সমবেদনা, অত্যাচারীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের গভীর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত।

বিকশমান পুঁজিতন্ত্রে সমৃদ্ধ একটি বিরাট জমিদার পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। স্বভাবতই দেশী ও বহু বিদেশী প্রথার প্রচলনের মধ্যে তিনি মানুষ। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের ফলেই ঐ পরিবারে একদিকে যেমন প্রবল ব্রাহ্মমত প্রচলিত অন্যদিকে তেমনি বহু হিন্দুসংস্কার দৃঢ়মূল। ইংরেজ-শাসনের প্রতি প্রাথমিক আস্থা দূরীভূত হলেও ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তখনো গড়ে ওঠেনি। আবার হিন্দু মেলার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতিগঠনের এক প্রবল সংস্কারস্পৃহাও গড়ে উঠেছিল। স্বাদেশিকতার মৃদু-উষ্ণ আবেশে রবীন্দ্রনাথের কিশোরমন উজ্জীবিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে।" (সভ্যতার সংকট) ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত মনে বিদ্রোহ শুধু জমা হয়ে উঠেছিল বাহ্যিক আচার আচরণের বিরুদ্ধে।

'বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে,' 'শেকস্পীয়রের নাটক ও বায়রণের কাব্যালোচনায় পরিশীলিত মন ইংলন্ডে গিয়ে পার্লামেন্টে এবং বাইরের নানা সভায় বুর্জোয়া উদারপন্থী ধ্যান-ধারণার উন্মুক্ত আলোচনায় পুষ্টিলাভ করল। রবীন্দ্রনাথের মনে 'চিরকালের ইংরেজের বাণী' শক্ত শিকড় গেড়ে বসেছিল।

এর সঙ্গে প্রথম তীব্র সংঘাত বাধল বাংলার বিস্তীর্ণ পল্লীঅঞ্চলে জমিদারী তদারকির কালে। গ্রাম বাংলার ভয়ংকর দুর্দশার ছবি রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী আত্মকেন্দ্রিকতাকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী এনে দাঁড় করাল। কতো তুচ্ছ এদের জীবনের উপকরণ— "গুটিকতক পোড়ো ঘর, কতকগুলি চালশূন্য দেওয়াল, দুটো একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ, আমগাছ, বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়," কত দৈন্য ভরা এদের জীবন। পল্লী মানুষের এই বিষাদময়তা কবির হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছে। সেজন্য তিনি লিখেছেন, "আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্র সম্বন্ধে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়,...আমি পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি। এর মুখে ভারি একটা সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে—আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই, আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারিনে, জন্ম দিই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে, এই জন্য স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালবাসি, এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।"

সাধারণ মানুষের প্রতি এই সীমাহীন ভালোবাসা অথচ তাদের দুঃখের অবসান করতে না পারার জন্য অক্ষম অসহায় বেদনাবোধ স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষোভের জন্ম দেয়। এই বিক্ষোভ তখনো কোন স্পষ্টতা লাভ করেনি তবে একটা গভীর অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। ছিন্নপত্রেই তার প্রমাণ আছে,

"এক এক সময় আমাদের দেশের লোকের ওপর এমন অসহ্য রাগ হয়। ইংরেজগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না বলে নয়, কিন্তু কোনো বিষয়েই কিছু করছে না বলে...। কেবল ইংরেজের কুড়ানো পেখম লেজে গুঁজে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নেচে নেচে বেড়াতে একটুখানি লজ্জা কিংবা হীনতা অনুভব করে না। এরা মনে করে কংগ্রেস করে সকলে মিলে দুই হাত তুলে গভর্ণমেণ্টের দোহাই পেড়ে এরা বড়োলোক হবে।..."

সাধারণ মানুষের প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববোধ থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। কংগ্রেসী রাজনীতির দেউলেপনায় তিনি বিরক্ত। কিন্তু বিকল্প কোন পথের নির্দেশও নেই। তবে একটা কিছু করতে হবে এই মনোভাবই তাঁকে পেয়ে বসল। গতানুগতিক জমিদারীর খোলস থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চাইছেন, নিজের শ্রেণীকে অতিক্রম করে বিপরীত শ্রেণীর সহমর্মী হওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন তাগিদ মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। তারও পরিচয় আছে ছিন্নপত্রে ঃ

"আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে জীর্ণতম কুটিরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠিত

হব না, আর যারা ফিটফাট কাপড় পরে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে,…আমি যদি কখনো তাদের সংস্রবের জন্য লালায়িত হই, তবে যেন আমার মাথার ওপর জুতো পড়ে।"

ভারতবর্ষের জনসাধারণের হৃদয়বিদারক এই নিদারুণ দারিদ্র্যে রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবেই বিচলিত হলেন। তিনি অনেক ভেবে স্থির করলেন, "ইংরেজ আমাদের প্রতি বিমুখ হোক বা প্রসন্ন হোক, সেদিকে দৃকপাত মাত্র না করে আমাদের উপেক্ষিত দেশ, উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে।" (ছিন্নপত্র ৮৪নং চিঠি) এই চিন্তার ফলেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দিল স্বদেশী সমাজ ও সমবায় নীতির পরিকল্পনা। শুধু পরিকল্পনা নয়, তাদের তিনি বাস্তবে প্রয়োগের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলার পল্লীঅঞ্চলে। তাঁর একান্ত উদ্দেশ্য ছিল ঃ

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা—এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;

এই গ্রামজীবনে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী। সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস স্বার্থোদ্ধত অবিচারের ভয়ে আত্মগোপন করছে। ঋণের দায়ে গরিব চাষী উপেনকে সব জমি খোয়াতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ছিল বিঘে দুই ভিটে জমি। তাও জমিদার কেড়ে নিল মিথ্যা দেনার খতে। কাঙালের ধন চুরি করেই তো রাজার ধন বাড়ে। অবশেষে ভিটে ছাড়া উপেনকে দেশান্তরী হতে হল। গাছের তলায় কুড়িয়ে পাওয়া দুটি আমের জন্যও জমিদার তাকে চোর সাব্যস্ত করলেন। চোখের জলেও উপেনের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। যিনি তার জমি চুরি করে নিয়েছেন তিনিই সমাজে সাধু বলে পরিচিত আর নিগৃহীত উপেন হল সেই সমাজে চোর।

স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ চিরে লক্ষ মুখে রক্ত চুষে পান করছে। অনাথিনী অসহায়া আশ্রয়চ্যুতা হয়। নায়েব গোমস্তার লোলুপ দৃষ্টি থেকে সমাজের উলুখড়কে আশ্রয় দিতে গিয়ে চক্রান্তে এবং মিথ্যা মামলায় আশ্রয়দাতাকে ভিটেছাড়া হতে হয়।

এই গ্রামের নিকট-সংস্রবে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন কি অমানুষিক অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের দিন কাটে। গরমের সময় যখন নদীর জল যায় কমে, তীরের মাটি যায় ফেটে, বেরিয়ে পড়ে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধু ধু করে তপ্ত বালু, তখন মেয়েরা বহুদূর থেকে ঘড়ায় করে জল নিয়ে আসে, বালু খুঁড়ে বের করে একটুকু জল। এই জল বাংলাদেশের অশ্রুজল মিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না, ওলাওঠা দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই গ্রামের মানুষদের অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে হাঁফ ছাড়বে এমন জায়গাও নেই।

মন বলে যে ওদের একটা জিনিস আছে তাও ওদের প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। "তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে ; সমস্ত দিনের দুঃখধান্দার রিক্তপ্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবেনা, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে। আর সে সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুতিক আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।"

শহরের অবস্থাও যে খুব ভাল তা নয়। সেখানে কলে কারখানায় যে শ্রমিকেরা খাটে তাদের পরিচয় তো আর নাম দিয়ে বা মনুষ্যত্ব দিয়ে নয়, সংখ্যা দিয়ে। সেখানে আছে এক শ্বাসরোধকারী নির্মম শোষণ ব্যবস্থা। শ্রমিককে শোষণ করে তাল তাল সোনার পিণ্ড তোলার দিকেই মালিকের ঝোঁক। এক একটি কলকারখানা এক একটি যক্ষপুরী। এখানকার মরা ধনের মাঝখানে প্রাণের ধন থাকতে পারে না।

এখানকার হরিপদ কেরানিরাও যেন আধমরা জগতের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে। কী অদ্ভুত অবস্থা এই পঁচিশ-টাকা বেতনের সরকারি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানির। যে বেতন পায় তাতে খাওয়া পরার সংকুলায় হয় না। তাই দত্তদের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে সেখানে খাওয়াটা জোটে। অল্পভাড়ায় একটা ঘর নিতে হয়। স্বভাবতই সেই ঘরখানার দেয়াল বালি-খসা, লোনা ধরা এবং মাঝে মাঝে স্যাঁতাপড়া দাগ। দরজার উপরে আঁটা মার্কিন থামের উপর আঁকা একখানা সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। এই কেরানি সন্ধেবেলায় ইস্টিশানে বেড়িয়ে ঘরে আলো জ্বালাবার খরচ বাঁচায়। যে গলিটায় এই কেরানির বাস সেটাও কোন অভিজাত পাড়া নয়!

"গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি
মাছের কানকো

মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে !"

সে অফিসে যায় হেঁটে। কারণ ট্রামের ভাড়া কুলোতে পারে না। মাথার উপরে আছে জরিমানা দেওয়া মাইনের মত বহু ছিদ্র বিশিষ্ট একখানা ছাতা। গায়ে থাকে ঘামে ভেজা অফিসের সাজ। বিয়ে করে সংসার করবে এমন সঙ্গতি তার নেই। সে জন্য ধলেশ্বরী নদীতীরের 'পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর' একটি মেয়ের স্মৃতি নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

এই চাষী-শ্রমিক মধ্যবিত্তদের নিয়েই সমাজের বারোআনা। এরাই 'সভ্যতার পিলসুজ'। এদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমেই সমাজের ধনবৃদ্ধি ঘটেছে, সভ্যতার আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে কিন্তু এরা সে ধন এবং আলো থেকে বঞ্চিত। এদের গা দিয়ে শুধু প্রদীপের তেল গড়িয়ে পড়ে। শুধু ঘাম ঝরে। পরিশ্রমের সার ভাগটুকু যায় অন্যদের ভোগে।

অনেক কাল ধরে এটাই নিয়ম হয়ে এসছে। কিন্তু তা চিরকাল চলতে পারে না। "কারণ, মানুষের প্রাণ বড়ো কঠিন, সে বাঁচিবার শেষ চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার যে কতটা শক্তি আছে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে তাহা সে নিজেই বোঝে না।" (ভারতবর্ষ ও স্বদেশ) ইতিহাসে এই শক্তি বারেবারেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম থেকে যে ভাবে তারা জোট বেঁধে জেগে উঠেছে এমনভাবে আর কোন দিন হয়নি। সেজন্য দেশে দেশে অত্যাচারীর ভিত কেঁপে উঠেছে। ধনতন্ত্রের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

এই মহাজীবনের, এই মহাপ্রলয়ের ডাক রবীন্দ্রনাথও শুনতে পেয়েছেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে তা প্রত্যক্ষ দেখে অভিভূত হয়েছেন, "এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটা ভীষন ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না ; কেননা, নাস্তানাবুদ করবার শক্তি যথেষ্ট আছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহু দূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না, কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়।"

অসাম্যের তাড়নায় নানা দেশে বহু বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। একদিন ফরাসী বিপ্লব শুধু ফরাসী দেশে নয়, সারা পৃথিবীর শোষণের ভিতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল কিন্তু উপযুক্ত সংগঠনশক্তির অভাবে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। অসাম্যের পীড়ন বন্ধ হয় নি। সেজন্য সোভিয়েত রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবে তা সমূলে উৎপাটিত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন জীবনাদর্শের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন ঃ

"য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুইই উঠেছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলই পাচ্ছে, অধিকাংশই পাচ্ছে না—এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটাই অনিবার্য ; বলেছিল মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে এবং লোভের কজেই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চলবে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটেরা যা বলতে চায় তার থেকে বুঝতে হবে, মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য, ভাগটাই মায়া—সম্যক চিন্তা সম্যক চেষ্টা দ্বারা সেটাকে যে মুহূর্তে মানব না সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে। রাশিয়ায় সেই না মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে চলছে। সব কিছু এই এক চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল।"

সোভিয়েত রাশিয়ায় যাবার আগেই নানা গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এদেশের জনসাধারণের কাছাকাছি এসেছিলেন, জন্ম-অভ্যস্ত আভিজাত্যের গণ্ডির প্রবল বাধা অনেকখানি অতিক্রম করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লেখা 'গোরা' উপন্যাসে জেল থেকে আনন্দময়ীকে লেখা গোরার চিঠির মধ্যে যেন রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। গোরা লিখেছিল, "পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বিনাদোষে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে বন্ধন এবং অপমান ভোগ করিতেছিল আজ পর্যন্ত তাহাদের কথা ভাবি নাই, তাহাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখি নাই—এবার আমি তাহাদের সমান দাগে দাগি হইয়া বাহির হইতে চাই ; পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম ভালো মানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়া আছে তাহাদের দলে ভিড়িয়া আমি সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চাই না।"

মানুষের প্রতি মানুষের দৌরাত্ম্য, অত্যাচার, অবিচারের প্রতিবাদে তিনি বারে বারে অভ্যস্ত আরাম ও সম্মানের আসন থেকে নেমে এসে অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কারণ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁর রচনা—"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন, সেইখানেতে চরণ তোমার রাজে" (১৩১৭) "হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান" (১৩১৭), "তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে/করছে চাষা চাষ পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,/খাটছে বারো মাস"

(১৩১৭)প্রভৃতি কবিতায় নিপীড়িত মানুষের প্রতি শুধু সমবেদনা নয় একাত্ম-চেতনা বর্তমান।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তিনিই একক কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, নিজের সরকারী খেতাব 'নাইট' উপাধি বর্জন করেছিলেন। ১৯১৬ সালেই রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়ে দেখলেন জাপানের সর্বত্র চীনকে লাঞ্ছিত করবার বিপুল আয়োজন। জাপানের অতিথি হয়েও তিনি সেই দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। চীনের উপর জাপানের অত্যাচারের-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল, সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মত দেশের চারিদিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা সেটা যে অসুন্দর, সে কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল।"

১৯৩১ সালে মেদিনীপুরের হিজলী জেলে নিরস্ত্র বন্দীদের হত্যা ও প্রহারের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত কলকাতার মনুমেণ্টের (বর্তমান শহীদ মিনার) পাদদেশে লক্ষাধিক লোকের জনসভায় সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 'শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব' বলে ধিক্কার জানিয়েছেন।

তারপর ১৯৩৭ সালে আন্দামানে অনশনকারী বন্দীদের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার টাউন হলের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং "দেশের বিধিবন্ধ আইন ও মানুষের স্বাধীনতার বিধিসংগত দাবির প্রতি ভারত সরকারের শ্রদ্ধাহীন মনোভাবকে ফ্যাসিস্ট মনে ভাব" বলে অভিহিত করেছেন। এই বছরে পাটকল শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘট হয়েছিল। অনেকদিন ধরে এই ধর্মঘট চলে।

রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মঘটকে সমর্থন করে হিন্দু পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন। "মাধো" নামক কবিতায় এই ধর্মঘটের প্রতিফলন দেখা যায়। গ্রামে জমিদারের অত্যাচারের ফলে মাধো এসে এক পাটকলের সর্দারির কাজ নিল। এক সময় পাটের বাজার নরম হওয়ায় পাটকলের মালিক মজুরদের মাইনে কমিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে 'মজুর হাজার হাজার ধর্মঘটে বাঁধল কোমর।' সাহেব মাধোকে ডেকে বলল, দলের সঙ্গে যোগ দিলে সেও মার খেয়ে মরবে। তখন

> মাধো বললে, "মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।"
> শেষ পালাতে পুলিশ নামল, চলল গুঁতোগাঁতা;
> কারো পড়ল হাতে বেড়ি, কারো ভাঙল মাথা।
> মাধো বললে, "সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,
> অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।" (মাধো)

১৯৩৮ সালে চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচার যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখনো রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন এবং জাপানের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও মনীষী নোগুচির নিজ দেশের সমর্থনে উত্তর প্রতিবাদ করে পত্র লিখেছিলেন।

এভাবে যখনই এবং যেখানে মানুষের অধিকার খর্বিত এবং লঙ্ঘিত হয়েছে তখনি রবীন্দ্রনাথের লেখনী তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। তাঁর এই প্রতিবাদের মধ্যে অবশ্য কোন রাজনৈতিক শ্রেণীচেতনা ছিল না, ছিল মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধ থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন রাজা-প্রজায় দ্বন্দ্ব, মালিকে শ্রমিকে বিরোধ। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শোষিত মানুষের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে হতে একদিন বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়। তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত', 'তপতী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা,' 'রক্তকরবী,' প্রভৃতি নাটকে প্রজাবিক্ষোভের কথা আছে কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরে এসে তিনি তাঁর 'কালের যাত্রা নাটকে দেখিয়েছেন 'শূদ্রের জয়'। বলেছেন, "ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ······এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।"

জীবনের শেষ পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে সংগ্রামী। অস্তাচলের ডাক যত নিকটবর্তী হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রামের আহ্বান তত দৃঢ় এবং সত্যাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। এ সময়ে তাঁর একমাত্র কামনা :

> মহাকাল সিংহাসনে
> সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
> কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
> কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন, (প্রান্তিক, ১৭ নং)

চারিদিকে যখন ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে, চারিদিকে যখন ভীষণ সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে তখন শুধু ধিক্কার দিয়ে কাজ শেষ হবে না। তার মূলোৎপাটনের জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাকে সার্থক করে তুলতে হবে। সেই আহ্বানই রবীন্দ্রনাথ করেছেন :

> নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
> শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
> বিদায় নেবার আগে তাই
> ডাক দিয়ে যাই
> দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
> প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। (প্রান্তিক ১৮ নং)

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন :

> দামামা ঐ বাজে,
> দিন বদলের পালা এল
> ঝোড়ো যুগের মাঝে। (জন্মদিনে ১৩ নং)

দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি অনুভব করেছিলেন বিশ্বব্যাপী এক বিরাট পরিবর্তন আসন্ন। কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বহু আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে 'নূতন জীবন নূতন আলোকে' নতুন দেশ জেগে উঠবে। এই সংগ্রামের সাথী হয়ে এই সংগ্রামী মানুষের একজন হিসেবেই তিনি নিজেকে পরিচিত করাতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি তোমাদেরি লোক।'

ব্রিটিশের বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ (৯৬৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

স্বদেশী-যুগে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে এই যুগের বিখ্যাত নেতা বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন যে "It was Rabindranath who had first preached the duty of eschewing all voluntary associations with official activities, and of applying ourselves to this organisation of our economic, social and educational life, independently of official help and control. Through the boycott of British Goods, as a protest against the partition of Bengal, originated with others, and was adopted by the political leaders of the country, in a public meeting assembled in the Town Hall of Calcutta, it was Rabindranath who first propounded an elaborate scheme for the practical boycott of the administration of the furthest limits that the laws of the land allow us to do. The idea of Rakhi celebrations, first inaugurated on the 10th October, 1905, the day when the partition was formally effected, as a standing protest against the official attempt to divide the Bengalee race, originated with Rabindranath" (B.C. Pal—Indian Nationalism-its Principle and Personalities).

১৯০৮ খৃীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ পাবনায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করে তিনি বাংলা ভাষায় সভাপতির ভাষণ দান করেন। ইংরেজের সৈন্য প্যুনিটিভ পুলিস, পুলিস রাজকতা, নির্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড, দলন, দমন ও আ নের বিভীষিকার পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসী কর্তৃক ব্রিটিশ পণ্যবর্জন, জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রবর্তনের তিনি প্রশংসা করেন। তিনি দেশবাসীকে বিশেষত যুবকদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে সমাজ সংগঠিত করার পরামর্শ দেন। গ্রাম বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জলকষ্ট নিবারণ প্রভৃতি এই সংগঠনের লক্ষ্য হবে কবি এই নির্দেশও দেন। ইতিপূর্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে তিনি তাঁর শক্তি ও সামর্থ নিয়োজিত করেছিলেন।

১৯০৮ খৃীস্টাব্দের পর রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে গঠন মূলক স্বদেশ-সেবায় সীমিত ক্ষেত্রে আত্ম-নিয়োগ করেন। অবশ্য তিনি কখনই আশু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজেকে রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। সৃষ্টিশীল সাহিত্য সর্জনার ব্যস্ততা সত্ত্বেও দেশবাসীর ডাকে তিনি দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে কোন দিনই ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নি।

১৯১৩ খৃীস্টাব্দে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৫ খৃীস্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁকে নাইট (Sir) উপাধি দেন। ১৯১৬ খৃীস্টাব্দের শেষ ভাগে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ কালে ওয়াশিংটন শহরে একটি বক্তৃতায় (Cult Nationalism) কবি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, তিনি শুধু ব্রিটিশ শাসনের নিন্দাই করেন নি, অপর পাশ্চাত্য জাতীয়দের সাম্রাজ্য ক্ষুধাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। এর ফলে পাশ্চাত্য দেশে তাঁকে বহুবিরোধিতার সম্মুখীণ হতে হয়েছিল। ১৯১৭ খৃীস্টাব্দের জুনমাসে শ্রীমতী আনি বেশান্ত ও তাঁর দুই সহকর্মীকে গভর্ণমেণ্ট্ রাজদ্রোহিতার অভিযোগ বন্দী করেন। রবীন্দ্রনাথ এর কিছুদিন পূর্বে বিদেশ ভ্রমণান্তর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছিলেন। বেশান্থের নির্বাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদও রাজদ্রোহ রূপে বিবেচিত হবে সরকার পক্ষ থেকে এই ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন ও কলকাতার দুইটি জনসভায় সেটি পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন যে "আমাদের রাজপুরুষেরা শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিয়া থাকেন যে তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে না অর্থাৎ ইংরেজ কর্তার হুকুম অনুযায়ী সব কিছুই চলিবে। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে দেখি যে তাহাদের ন্যায়-রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেস্টিজ রক্ষাকে তাহারা বড়ো মনে করে এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে, প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আন্দামানে পাঠাতে পারলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়, এইটেই ত বিশ্ববিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা।—আমি যদি ভীরু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতত্ত্বে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিস্টেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেস্টিজ-দেবতা নরবলি দাবি করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিবাদ করিবেই। কবি এই অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করে বলেন "বাহিরে দুঃখ শ্রাবণের ধারার মত আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখ ভোগের তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি, সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এসো প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও। আমাদের মধ্যে যে অদীন যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর, তুমি তাহারই প্রভু—ডাকো আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে। দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির নির্বাসন লাভ করুক" (রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিক সং ১৩, পৃঃ ২৩২-২৪৮)।

১৯১৯ খৃীস্টাব্দে দেশময় ব্রিটিশ রাজ্যের দমন নীতি চণ্ডরূপ গ্রহণ করেছিল। কুখ্যাত 'রৌলটঅ্যাক্ট' এই সময়

চালু হয়। পাঞ্জাব দেশের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে ১৩ এপ্রিল বহু নিরস্ত্র নিরীহ নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী থাকায় পাঞ্জাবকে দমননীতির তান্ডবলীলার সংবাদ বাইরে আসতে দেওয়া হয় নি। কবি মে মাসের শেষ দিকে কোনও সূত্রে এই হত্যালীলার সংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ছুটে আসেন। বিচলিত কবি এবিষয়ে কলকাতায় একটি প্রতিবাদ সভা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন; পাঞ্জাবের এই দুর্দিনে তিনি নিজে অত্যাচারিত জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পাঞ্জাবে যাওয়ার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। উপায়ান্তর না পেয়ে ৩০ মে ক্ষুব্ধ কবি তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে একটি চিঠি লিখে তাঁর নাইটহুড বা 'সার' উপাধি ত্যাগ করেন। দমন নীতির সন্ত্রাস পীড়িত ও কণ্ঠ রুদ্ধ কোটি কোটি দেশবাসীর প্রতিবাদ ও মর্মবেদনাকে ভাষা দেওয়ার জন্যই ছিল রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগের চিঠি ('to give voice to the Protest of millions of my Countrymen suppressed into a dumb anguish of terror')। অল্প দিন পরে কবি স্বয়ং ইংলণ্ডে গিয়ে ভারত সচিব লর্ড মণ্টেগুর সহিত দেখা করে তাঁকে জানান যে পাঞ্জাবের এই নির্মম হত্যা কান্ড যে নীতি বহির্ভূত হয়েছে তা বৃটিশ জাতির স্বীকার করা উচিত। মণ্টেগু তাঁকে জানান যে এ বিষয়ে একা তিনি কিছু বলতে অক্ষম তবে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ নিদারুণ ঘটনা না ঘটে সেজন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জালিয়ানওয়ালা বাগ তথা ভারতে ইংরেজের দমন নীতি সম্বন্ধে কবির মনোভাব সি, এফ, এণ্ড্রুজকে লিখিত একটি পত্রেও পরিস্ফুট হয়েছে "It shows that no outrage, however monostrous, committed against us by agents of this Government, can arouse feelings of indignation in the hearts of those from whom our Governors are chosen........." [Letters to a friend, July 22, 1920)। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লবন আইন ভঙ্গ উপলক্ষে মহাত্মাগান্ধী ও তাঁর কয়েক সহস্র অনুগামী বন্দী হন, বহুস্থানে পুলিসী অত্যাচার ঘটে। এই সময় চট্টগ্রামে বিপ্লবীগণ কর্তৃক অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। শোলাপুরে সামরিক আইন জারী করা হয়, সেখানকার তিনজন সম্ভ্রান্ত যুবককে ফাঁসী দেওয়া হয়। সমগ্র দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু ও জওহরলাল নেহেরু সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে এই সময় কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। দমন নীতি বিমূঢ় দেশবাসীকে স্তম্ভিত করে এই সময় ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বেধে উঠেছিল। বড়লাট বিশেষ ক্ষমতা বলে এই সময় ৬টি দমন নীতি মূলক অর্ডিনান্স জারী করেন। ইউরোপ ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথ দেশ থেকে বিভিন্ন সূত্র এই সব সংবাদে বিশেষ বিচলিত হয়ে ওঠেন। Manchester Guardian-এর প্রতিবেদকের নিকট ১৬ মে কবি তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন যে, "Those who are experienced in bureaucratic irresponsible Government can easily understand how repressive measures like those culminating in the martial law at Sholapur are bound to react. Though much suppressed, news is trickling through travellers from India telling how cruel and arbitracy punishment are meted out to entirely inoffensive persons. Though such actions were called forth by the high sounding names of law and order they are themselves the worst breaches of law of the humanity which I feel are greater than any other law"। জার্মানী থেকে প্রেরিত লণ্ডনের 'Spectator' কাগজে কবির একটি পত্রও প্রকাশিত হয় (৩০ আগস্ট)। এই চিঠিতে ভারতের অবস্থা বিশেষত ঢাকায় ইংরেজ সৃষ্ট হিন্দু মুসলমানে হাঙ্গামার উল্লেখ করে কবি মন্তব্য করেন "A fact of very grave significance at the present crisis in the British rule in India has simply puzzled my mind... .." ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার বাণী সমন্বিত এই পত্রটি বার্মিংহামের council for Indian Freedom কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত ও বিতরিত হয়েছিল। কবি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথমে দেশে ফিরে আসেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ইংরেজ রাজের প্ররোচনায় চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের সুযোগে হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পরই ইংরেজ-প্ররোচিত হিন্দুমুসলমান বিরোধ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন না দেওয়ার যুক্তিরূপে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি। যাতে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেওয়া যায় যে, বৃটিশরাজের পাহারা আলগা হওয়া মাত্রই অরাজকতা দেখা দেবে, সুতরাং ভারতবাসী স্বদেশের দায়িত্বভার পাবার উপযুক্ত নয় (হিন্দু মুসলমান, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৮)।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে সামান্য অজুহাতে মেদিনীপুরের হিজলী বন্দীশালায় সশস্ত্র পুলিস রাজনৈতিক বন্দীদের উপর গুলি চালায়। এই সময় বহু বাঙালী যুবক বিনা বিচারে এই বন্দীশালায় অন্তরীণ ছিলেন। রাত্রের অন্ধকারে গুলি চলায় বহু বন্দী যুবক আহত হন এবং সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নামে দুই যুবক নিহত হন। সমস্ত দেশ নিরস্ত্র ও অসহায় বন্দীদের প্রতি এই অত্যাচারের সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য লাভের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে দার্জিলিং যাবার উদ্যোগ করছিলেন। পুলিসের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় মনুমেন্টের পাদদেশে বিরাট জনতার সম্মুখে এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত হয়ে অসুস্থ কবি একটি ভাষণে তাঁর গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেছিলেন। কবি বলেন যে এই ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে যে ভারতে বৃটিশ শসেনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে। শাসককুলকে তিনি এই বলে সতর্ক করে দেন যে প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কবি দেশবাসীর পক্ষ নিয়ে বলেন যে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করার স্থৈর্য যেন আমরা রাখতে পারি। নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও যেন কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হন। এর কিছুদিন পর জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য কয়েকজন নেতাকেও কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনা পরম্পরায় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীকে একটি তারবার্তায় জ্ঞাপন করেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধাররা ভারতবাসীর সঙ্গে যে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে চান ভারত সরকার অনুসৃত দমন-নীতি (যে দমননীতির ফলে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে) তার প্রবল অন্তরায়। এই কারণে ব্রিটিশের সঙ্গে কোনরূপ বোঝাপড়া ভারতবাসীর পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই সময়ে কবি তাঁর সুবিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটি রচনা করেন, এরই শেষ ছত্রে আছে 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো'। এই 'যাহারা' যে প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কবিতাটির মধ্যে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৩৬ এর ১৫ জুলাই কলকাতা টাউন হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে আহূত একটি বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। অসুস্থ কবির জন্য সভাস্থলে তাঁর 'অক্সিজেন' গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল। কবি তাঁর ভাষণে আইন সভাগুলিতে সম্প্রদায় ভিত্তিক আসন বন্টনের অভিপ্রায়কে দেশের রাজনৈতিক জীবনকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য ইংরেজ শাসকের একটি কুট কৌশলরূপে অভিহিত করেন। ইংরেজ শাসকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন যে "কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সাময়িক কালের জন্য নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়া অপমানের বোঝা বহিতে বাধ্য করা যায় বটে কিন্তু তাহাদিগকে চিরতরে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না।"

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ কবির ৮১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের উৎসব সভায় কবি একটি ভাষণ দান করেন। "সভ্যতার সংকট" নামীয় এই ভাষণটি কবির স্বদেশ প্রেম ও মানবতাবাদের একটি অমূল্য নিদর্শন। বৃটিশ বিরোধিতার দলিল রূপেও এটি অবিস্মরণীয়।

এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মী-ছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে! জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অন্তরের সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলে হয়ে গেল।"

ব্রিটিশ শাসনের নিন্দা করে ও তাকে ধিক্কার দিয়েই কবি তাঁর বক্তব্য অবশ্য শেষ করেন নি, মানুষের উপর তিনি আস্থা হারান নি, নব দিগন্তের দিকেও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, নিরাশা-পীড়িত জাতির চিত্তলোকে আশার প্রদীপটিও তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। এই ভাষণের উপসংহারে তিনি বলেছিলেন, "আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈব বাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে ঃ

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি
ততঃ সপত্মান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

সভ্যতার সংকট, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক খং, ১৩,পৃঃ ৪০৬-১১। কবির এই সতর্কবাণী শুধু তৎকালীন ইংরেজ সম্রাজ্যবাদীদের প্রতিই উচ্চারিত হয়েছিল তাই নয়, সর্বদেশের সর্বকালের পর-শোষক, পর-পীড়ক ক্ষমতামদোদ্ধতদের উদ্দেশ্যে এটি বর্ষিত হয়েছিল। নিপীড়িত মানুষের কাছে এটি সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করেছিল। এই ভাষণটি রচনার পর কবির ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়। পরবর্তী ২২ শে শ্রাবণ, অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় স্থানান্তরিত কবি তাঁর

পৈতৃক বাস ভবনে পরলোক যাত্রা করেন। ২২ শে শ্রাবণ ও ১ বৈশাখের মাঝামাঝি কবি আর একবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অনলবর্ষী অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে যান। সম্ভবত এইটিই তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার শেষ স্বাক্ষর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশবাসী ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতায় সম্মত হয় নি, ভারতের স্বাধীনতা দাবির প্রতি ইংরেজদের অনমনীয় প্রতিকূলতাই এর একমাত্র কারণ ছিল। যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতা ও সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য ৪১ এর মার্চ মাস পর্যন্ত সমগ্র ভারতে প্রায় পাঁচ হাজার সত্যাগ্রহীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এই সময় Miss Rathbone নামে বৃটিশ পার্লামেন্টের এক সদস্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বয়ং নিযুক্ত প্রতিভূ হিসেবে ভারতবাসীর নিন্দা করে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে একটি 'খোলা চিঠি' প্রকাশ করেন। এই 'খোলা চিঠি'তে বলা হয় যে ইংরেজের কৃপায় ভারতবাসী শিক্ষা লাভ করেছে, তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ভারতবাসী এতই অকৃতজ্ঞ যে ইংরেজের বিপদের দিনে তারা ইংরেজের এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছেনা, নেতাদের কথায় যুদ্ধ-বিরোধী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইনি ভারতবাসীকে এই বলে ভয়ও দেখান যে ভারতবাসীর সমর্থন না পেলেও যুদ্ধে জয়লাভ ইংরেজের অবধারিত। এই খোলা চিঠি সংবাদপত্রে পাঠ করে কবি ভারতবাসী হিসেবে খুবই অপমানিত বোধ করেন।

নিদারুণ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিরক্ত ও বিচলিত রবীন্দ্রনাথ এই ধৃষ্ট খোলাচিঠির একটি জবাব দেন। অসুস্থতার কারণে নিজের সেক্রেটরির সাহায্যে এই জবাবটি লিপিবদ্ধ করিয়ে তিনি এটি ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফৎ প্রচারিত করেন। এটি৫ জুন (১৯৪১) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। মিস্ র‍্যাথবোনের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে কবি বলেন, যে কজন ভারতবাসী যথার্থ শিক্ষিত তার জন্য তাঁদের ইংরেজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কারণ নেই, কারণ এঁরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষিত করেছেন। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতের শতকরা একজন মানুষ মাত্র ইংরেজি শিক্ষিত। ইংরেজ শাসন বহির্ভূত রাশিয়ার শিক্ষিতের হার শতকরা আটানব্বুই। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ভারতবাসী ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আস্বাদ করতে পারে না, উচ্ছিষ্টটুকু পেয়ে থাকে, আর নিজেদের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। প্রায় দুশত বৎসরের বৃটিশ শাসনের পরও ভারতে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকে, অধিকাংশ দেশবাসী অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটায়। দেশের সর্বত্র নিদারুণ জলাভাব, জলের জন্য হাহাকার দেশ-জোড়া। দেশে শান্তি-শৃংখলার অবস্থাও শোচনীয়; চুরি ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা; নারী-হরণ, নারী নির্যাতন দেশের মধ্যে একটা দৈনন্দিন ঘটনা। ভারতবাসীকে আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। ভারতের লোকদের নিরস্ত্র ও পৌরুষহীন করে রাখা হয়েছে যে দাসত্ব শৃংখলে তাকে স্বেচ্ছায় চুম্বন করতে বলা ইংরেজের পক্ষে নিষ্ঠুর হৃদয় হীনতা। ইংরেজ ভারতবাসীর কল্যাণের 'অছি' বলে সভ্যসমাজে পরিচয় দিয়ে থাকে, কিন্তু ভারতের কল্যাণের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতক। ভারতের কোটি কোটি লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় কেড়ে নিয়ে ইংরেজ তার নিজের দেশকেই শুধু সমৃদ্ধ করেছে। ভারতবাসীর এত অনিষ্ট ও ক্ষতি করা সত্ত্বেও ভারতবাসী যে নিষ্ক্রিয় আছে ইংরেজের এই বিপদে সে যে প্রত্যাঘাত করেনি তার জন্য ইংরেজের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু (মিস্ র‍্যাথবোনের মত) ইংরেজজাতির মুখপাত্রেরা এত অনিষ্ট করার পর আবার অপমানও করবে এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবে তা একেবারে সহ্য সীমার বাইরে (দ্রঃ বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮)। অপমানিত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের এই নির্ভীক, বলিষ্ঠ ও সুচিন্তিত বিবৃতি ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজ জনমতের ধৃষ্টতাপূর্ণ স্পর্ধিত ও অনাস্থা ও অশ্রদ্ধাকে সেদিন পরিপূর্ণভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কারারুদ্ধ নেতৃবৃন্দের রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ও বন্দিনী ভারতমাতার যুগসঞ্চিত মর্ম-বেদনা সেদিন একমাত্র জাতীয় কবির প্রতিবাদের মধ্যেই মূর্ত হতে পেরেছিল।

বিশ্বমানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতেই নয়, সর্বদেশেই শাসন-শোষন নিপীড়নের বিরোধী ছিলেন। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী উদ্ধত শাসক মূর্তিকে তিনি কোন দিন ভয় করেন নি, ক্ষমা করেন নি। জীবনের শেষ পর্বে লেখা কবিতাগুলিতে তাঁর প্রমাণ আছে। বিশেষ ভাবে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে—

"আর বার সেই শূন্যতলে
        আসিয়াছে দলে দলে
লৌহ বাঁধা পথে
অনল নিঃশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ;
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল.
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ বেড়াজাল।
        জানি তার পন্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

(ওরা কাজ করে ২৩. ২. ১৯৪১; আরোগ্য)

কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী কি সার্থক হয়নি?

মিস্ র‍্যাথবোনের খোলা চিঠি:



নেপাল মজুমদার

১৯৪১ সালের মে-জুন মাসের কথা। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, ২২ তারিখ নাগাদ, বোম্বাইয়ে হিন্দু মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গা ক্রমেই বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের তেমন কোন তৎপরতা দেখা গেল না। আমেদাবাদ এবং ঢাকার দাঙ্গাও সম্পূর্ণ হয়নি। গান্ধীজিরও ধৈর্য-চ্যুতি ঘটে। তিনি বলেন (২৩শে মে, '৪১), 'The law of Jungle must go'. মুষ্টিমেয় দাঙ্গাবাজদের গুণ্ডামি ও হামলার প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন 'Resist Goonda-ra violently or non-violently'. তিনি স্পষ্টই বলেন "আমাদের পক্ষে জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব সুস্পষ্টভাবে বলা উচিত যে, ভয়ে পলায়ন করা কাপুরুষতা। তাদের কর্তব্য প্রতিরোধ করা। অহিংস প্রতিরোধ প্রকৃষ্ট উপায়, কিন্তু তারা যদি অহিংসভাবে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয় তা হলে হিংসভাবে হলেও তাদের প্রতিরোধ করা কর্তব্য।

বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর এই নির্দেশ জনসাধারণের জন্য,—কংগ্রেস কর্মীদের তিনি আরো কঠোরভাবে অহিংস প্রতিরোধের আহ্বান জানান। কিন্তু বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীরা এই নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। অনতিকাল পরেই বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতা কে. এম. মুন্সী এই অহিংস প্রতিরোধ-নীতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

যুদ্ধ তখন ভূমধ্যসাগরে ক্রীটে এবং মধ্যপ্রাচ্যে সিরিয়া ও লেবানন এলাকায় প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। ক্রীটের যুদ্ধই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ও রোমহর্ষক। স্মরণ রাখা দরকার গ্রীক ও মিত্র শক্তি বাহিনীর হাতে ইতালীয় সেনারা চরম পর্যুদস্ত হওয়ার পর জার্মানী যুগপৎ গ্রীক ও যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে। গ্রীসের পতনের পর গ্রীক সরকার ক্রীট-দ্বীপে রাজধানী স্থানান্তরিত করে। এরপর গ্রীক ইংরেজ ও নিউজিল্যাণ্ডীয় সেনাবাহিনী সমবেতভাবে ক্রীট রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে থাকে। ২০ মে, জার্মানরা ক্রীটের উপর প্রচণ্ড বিমান হানা দেয়। জার্মান বিমানবহর ও প্যারা সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ব্রিটিশ সেনা ও বিমানবহর পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষের মধ্যে গ্রীসের রাজধানী ও সদর দফতর ইজিপ্টে স্থানান্তরিত হয় (২৫ মে)। ঐ দিনই বিখ্যাত ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'H. M. S. Hood' বিধ্বস্ত ও জলমগ্ন হয়, অবশ্য জার্মানীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধ-জাহাজ 'বিসমার্ক'ও ঘায়েল হয়। তিন দিন অনুসরণের পর ব্রিটিশ নৌবহর ও টর্পেডোর আঘাতে 'বিসমার্ক' বিধ্বস্ত এবং জলমগ্ন হয়। এই সংবাদে সারা ব্রিটেন ও মিত্রশক্তি মহলে প্রচণ্ড আনন্দ-উল্লাস পড়ে যায়। বস্তুতপক্ষে, এর পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তি বাহিনীর প্রতিআক্রমণ প্রবলতর হয়। ক্রীট অধিকারের লড়াইও তীব্র ও ভীষণ-তর হয়। ২৮ মে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সারা যুক্তরাষ্ট্রে 'জাতীয় জরুরী ব্যবস্থা' ঘোষণা করেন। ব্রিটেনে সমরোপকরণ ও রসদ সরবরাহ করাই যে এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেকথাও তিনি ঘোষণায় পরিষ্কার উল্লেখ করেন।

ঐদিনই মিস্ ইলিনর র‍্যাথবোন (Miss Eleanor E. Rathbone) নামে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক মহিলা সদস্য ভারতবাসীর উদ্দেশে এক দীর্ঘ 'খোলাচিঠি' প্রকাশ করেন। 'রয়টর'এর মাধ্যমে সেটি সর্বত্র প্রচারিত হয়।

মিস্ র‍্যাথবোন ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সদস্য মিঃ উইলিয়াম র‍্যাথবোনের কন্যা (বয়স ৬৭)। ইনি লিভারপুল সিটি কাউন্সিলের সর্বপ্রথম মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সাল থেকে তিনি ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নির্বাচিত সদস্যরূপে পার্লামেন্টে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে অনারারী ডি. সি. এল. ডিগ্রীও লাভ করেন। তিনি ভারতের বাল্যবিবাহ সম্পর্কে একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন।

মিস্ র‍্যাথবোন তাঁর এই খোলাচিঠিতে অত্যন্ত অশালীন ও তীব্রভাষায় কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিন্দাবাদ ও আক্রমণ করেন। কয়েকমাস ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল এবং এই আন্দোলন উপলক্ষে কংগ্রেস নেতারা বিশেষত জওহরলাল ব্রিটিশের যুদ্ধ ও ভারত সংক্রান্ত নীতির সমালোচনা করে যেসব উক্তি ও মন্তব্য করেন, সেগুলিই ছিল মিস র‍্যাথবোনের উষ্মা ও গাত্রদাহের প্রধান কারণ। বলা বাহুল্য, এই খোলাচিঠি কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গেলেও জওহরলালই ছিলেন আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। চিঠিখানির মর্মার্থ (আনন্দবাজার পত্রিকা-১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ৩০ মে, ১৯৪১) ছিল এই ঃ

কমন্স সভা
২৮ মে

প্রিয় বন্ধুগণ,

এ দেশের যাঁহারা পূর্বে ভারতীয় জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন সংগ্রামে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা এখন ভারতে শাসন-তান্ত্রিক অচল অবস্থা ও তজ্জনিত অপ্রীতিকর পরিণতিতে গভীর উদ্বেগবোধ করিতেছেন। আমার অধিকাংশ ইংরাজ বন্ধু এই অচল অবস্থার জন্য আমাদের গবর্নমেণ্ট কতখানি দায়ী এবং ইহার অব-সানের জন্য তাঁহারা কি করিতে পারেন তৎসম্পর্কে অবহিত হইয়া-ছেন। তাঁহারা হয়তো ঠিকই করিতেছেন, কেননা আমাদের দায়িত্ব সেইখানেই। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা ঝুঁকি আছে। তাঁহাদের এই মনোভাব দ্বারা অসহযোগী ভারতীয়েরা এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইতে পারেন যে, প্রগতিশীল ইংরাজমাত্রেই বুঝিবে তাঁহাদের সহিত ইঁহারাও ব্যৃটিশ কর্তৃপক্ষের উপর সমস্ত দোষারোপ করিতেছেন। এজন্য আমি বিপরীত পথ গ্রহণ করিয়াছি ; আমি অসহযোগীদের বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে তাহাই উত্থাপন করিতে চেষ্টা পাইব। অপরপক্ষের কথা কিছুই বলিব না। আমি জানি তাহাদেরও কিছু বলিবার আছে। সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হই-য়াছে আমি তাহারও আলোচনা করিব না কারণ আমা-অপেক্ষা উপযুক্ত লোকেরা তাহা করিতেছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমি এক-জন অভিজ্ঞ এরূপ দাবি আমি করি না। আমি পার্লিয়ামেন্টের এক-জন নগণ্য সদস্যা এবং কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত নহি ; ভারত সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশে, ইহার বেশী দাবি আমি করি না। ইংরাজ মহিলাগণ যেরূপ সামাজিক সংস্কার ও রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন করিয়াছে ভারতের মহিলাদিগকে সেদিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই আমি ১৯২৯এ বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনকেন্দ্র হইতে দাঁড়াইয়াছিলাম। এই উদ্দেশ্যেই আমি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এত-ৎসংশ্লিষ্ট আন্দোলনকারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভারতে গিয়া-ছিলাম। ভারতের সংস্কারসাধনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে নারী আন্দোলন সংঘবদ্ধ ও পরিচালিত করি। তাহার ফলে ১৯৩৫এর আইন প্রণীত হয়। তাহার পর ভারতে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে একখানি পুস্তক লিখি। বইখানা তথ্যপূর্ণ নিখুঁত ও নিরপেক্ষ বলিয়া সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে ইহা আমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত একপক্ষের নিন্দা।

অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নাৎসী ও ফ্যাসিস্ত আক্রমণের নিন্দা করিয়াছেন ; তাহাদের অত্যাচার নিপীড়নে বেদনা প্রকাশ করি-য়াছেন এবং দুর্গতদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছেন ; যুদ্ধের পূর্বে পূর্বতন বৃটিশ গবর্নমেণ্ট মাঞ্চুরিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন, চেকশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আক্রমণকারীদের নিকট নতিস্বীকার ও সুবিধাদান দ্বারা যে আপসনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। এখন পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের অনুবর্তিগণ যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকারে বাধা দিতে চাহিতেছেন। কেবল যে তাঁহারা ইহার কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই তাহাই নহে, আইন অমান্যের সাহায্যে তাঁহারা শাসনযন্ত্রকে অচল করিতে চাহিতেছেন। সুতরাং ফলে তাঁহারা নিরপেক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, করিয়াছেন আক্রমণকারীদের অহিংস মিত্রদের। তাঁহাদের দেশের স্বার্থের খাতিরে হিটলারকে সাহায্য দিতে ঘৃণাবোধ করা সত্ত্বেও, ইহাদের অবস্থাটা ভিসি কর্তৃ-পক্ষের মত দাঁড়াইয়াছে। অথচ হিটলারের হাতে কয়েক লক্ষ বন্দী আছে ভিসির এই যুক্তি তাঁহাদের নাই। জবাব আসিতে পারে যে তাঁহাদের এরূপ অভিপ্রায় নাই। ভারতের বিনা সম্মতিতে যুদ্ধে যোগদানে আপত্তি জানানই তাঁহাদের অভিপ্রায়। তাহা হইলে আমরা অসহযোগীদের একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি ঃ যদি ভারতের পরা-মর্শ লওয়া হইত, তবে কি জবাব পাওয়া যাইত? সম্মতিসূচক জবাব হইলে বলিতে হয়, নিয়মানুগভাবে পরামর্শ না করা যতবড় ভুলই হইয়া থাকুক তাহা কি এমন জরুরী অবস্থায়ও এতই অমার্জনীয় যে আপনাদের সমগ্র মনোভাব একেবারে পাল্টাইয়া গেল—এমনই পাল্টাইল যে আপনারা আমাদের মিত্র না হইয়া আক্রমণকারীদের মিত্র হইলেন? কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহা ছাড়া আর কি?

যদি উহা 'না' হইত, তুষ্টিসাধনের নিন্দা করিয়াও যুদ্ধে সাহায্য না করার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত কেমন করিয়া? যদি উত্তরে ভারতের স্বাধীনতা লাভের শর্তে 'হাঁ' বলা হইত, তবে তুষ্টিসাধন নীতির পরিপোষকগণ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে অপরের স্বার্থের ক্ষতি করিয়াছেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে এক্ষেত্রে কি আপনারাও তাহাতেই অভিযুক্ত হইতেন না? তাহাতে আপনারাও কি বৃটেনের জরুরী সংকট অবস্থার সুযোগ গ্রহণে বা পুরাতন আঘাতের প্রতিঘাত দিতে অসমর্থ হইতেন না?

আমি জানি অসহযোগীরা বলেন তাঁহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করি-বার অথবা ইংলন্ডের সংকট অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবার কোনরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন না। কিন্তু ঐরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের নাই, এ কথা কি নিঃসন্দেহে বলা যায়?

ভারতের শ্রেষ্ঠ যুবনেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তবে কিজন্য বারবার পুরাতন মতের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 'এই সকল কথা আমরা কখনই ভুলিতে বা উপেক্ষা করিতে পারি না?' (ইউনিটি অব ইণ্ডিয়া, ৩৯৯ পৃষ্ঠা লিণ্ডসে ড্রুমণ্ড, ১৯৪১) ভারতবর্ষ যুদ্ধে সাহায্য করিবে কি না এই প্রসংগে তবে কি জন্য তিনি ১৯১৯ খৃস্টাব্দের অমৃতসর হত্যাকাণ্ডের এবং পাঞ্জাবের সামরিক আইন জারীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ সাহায্য দান করিবার পরই ঐ সকল ঘটনা এদেশে ঘটান হইয়াছিল?

যদিও কোন কোন ইংরেজ অমৃতসরের নৃশংসতা ক্ষমা করিয়া লইয়াছেন, তথাপি অধিকাংশ প্রগতিশীল ইংরেজ উহার জন্য গভীর-ভাবে লজ্জিত। যে জেনারেলের আদেশে হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়, এক পার্লিয়ামেণ্টারী কমিশন তাঁহার নিন্দা করেন এবং তাঁহাকে পদ হইতে অপসারিত করা হয়। কিন্তু গত যুদ্ধে ভারতের সাহায্য প্রদা-নের পর কি কেবলমাত্র এই সকল ঘটনাই ঘটিয়াছিল? ভারতবাসীর

পূর্ণ দাবির তুলনায় যতই কম হউক না কেন, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন রচনা পর্যন্ত যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি, ভারতের শাসন ব্যবস্থা ভারতবাসীর দ্বারাই প্রণীত হইবে এই সর্বশেষ ঘোষণা—এ সকল কি একেবারে কিছু নয়?

ইংলণ্ড যতদিন পর্যন্ত **তুষ্টিসাধন**-নীতি অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছে, ততদিন যে আইনঅমান্য আন্দোলন বন্ধ ছিল, তাহা পুনরায় ইংলণ্ডের সংকট সময়ে [illegible] আপনারা উহার সুযোগ লইতেছেন ছাড়া আমরা আর কি মনে করিতে পারি? ঠিক যে সময়ে আমরা অত্যন্ত বিপদাপন্ন—ফ্রান্সের পতনের পর মিঃ চার্চিল যখন আমাদিগকে সম্পূর্ণ একক অবস্থায় পরিশ্রম, অশ্রুপাত, দুঃখদাহ ও রক্তপাতের সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন, ঠিক সেই সময়ই আপনারা ঐ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। **ইহা কি ঔদার্যের** পরিচায়ক?

পণ্ডিত জওহরলাল, আপনিই একদিন বলিয়াছিলেন, 'ইংলণ্ডকে এক সময় আপনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন'। আপনার এই কথার আজ কি অর্থ আমরা করিব? যে ইংলণ্ডকে আপনি ভালবাসিতেন, আপনার কার্য ও প্রভাব দ্বারা তাহার জন্য কোন সৌভাগ্য আপনি নিরূপিত করিয়া দিতেছেন?

একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার। আপনার এবং আপনার অনেক সহকর্মীর পক্ষে ইংলণ্ডকে ভালবাসিবার অথবা অন্ততপক্ষে ইংলণ্ডের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবার কারণ আছে। ইংরেজের চিন্তাধারা আপনারা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে ইংরেজ শিক্ষকগণের নিকট এমন কি, বৃটিশ রাজনীতিকগণের নিকটও আপনারা বিশেষভাবেই ঋণী। এইখানেই সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছিল।

সেই জন্যই হয়ত ইহা আশা করা হয় না যে, আপনাদের সহিত একটা আধ্যাত্মিক বন্ধনের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু আপনার দেশের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য এ সকল কিছুই আপনারা মনে রাখেন নাই। ভারতবাসী ভারতের সমস্যাকেই প্রাধান্য প্রদান করিতেছেন, ইহাতে আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিই না। কিন্তু যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিয়া তাঁহারা কিভাবে দেশ সেবা করিতেছেন বলিয়া মনে করিতে পারেন?

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, তাঁহাদিগের বাধা দানের ফলে আমরা পরাজিত হইব এবং জার্মানী, ইটালী ও জাপান জয়লাভ করিবে তবে একথা সত্য যে, জয়লাভের পর ইটালী যেরূপ পশ্চিমে লুঠের মাল বখরা লইবার জন্য অকস্মাৎ আসিয়া দেখা দিয়াছে, পূর্বেও তেমনি জাপানকে দেখা যাইবে। **তাহাতে কি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা** লাভ করিবে?

১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে যখন আমরা আমাদিগের পরাজয় নিকটবর্তী দেখিতেছিলাম, তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করিয়াছিলেন—'আমরা দায়িত্ব ও বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। আমরা বৃটিশ সেনাদল ও নৌশক্তির তথাকথিত আওতায় থাকিয়া পরিত্রাণ পাইতে চাহি না। আমরা নিজেরাই সকল ব্যবস্থা করিতে পারি।' ইহা অত্যন্ত বে-হিসাবী গর্ব, সন্দেহ নাই। কোন জাতিকে প্রস্তুত হইতে হইলে **আজকাল অতি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।** বিজয়ী আক্রমণকারীরা আজকাল আর সময় দিয়া আক্রমণ করে না। তাহারা ভারতবর্ষের বুকের উপর যে নৃশংসতার অনুষ্ঠান করিবে তাহা অমৃতসরের ঘটনার তুলনায় অনেক অনেক ভয়াবহ।

আপনাদের সাহায্য ছাড়াও আমরা জয়লাভ করিব। ভারতীয় অন্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য আমরা ভালোভাবেই পাইতেছি। তবে আপনারাও আমাদের সহযোগিতা করুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। আমরা ইহা বেশই অবগত আছি যে, আজ যেসব নরনারী কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন, পূর্বে তাঁহাদেরও অনেকে রাজন্য ও উত্তর ভারতের সামরিক সম্প্রদায়গুলির যাহা আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা নহে, তাহাই লাভের জন্য আমাদের সহিত একত্রে কাজ করিয়াছেন। ইহা বড়ই মর্মান্তিক যে, আমাদের এই দুঃসময়ে আপনারা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা সকলেই মরণের ছায়ালোকে বাস করিতেছি। এমন রাত্রি খুব কমই কাটে যাহার অবসানে প্রাতে আমাদের কোন না কোন শহরে বা গ্রামে আমাদের দেশবাসী নরনারী এবং শিশু বিস্ফোরণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া, পিষ্ট হইয়া ও ধ্বংসস্তূপের নীচে জীবন্ত চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় না। প্রতিদিনই স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সম্পদ যুবকগণ প্রাণ হারাইতেছে। আপনাদের করুণা উদ্রেকের জন্য এই সব কথা আমি বলিতেছি না। আমাদের যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং উহা এইরূপ প্রতিকূল করিতে আপনারা কি করিয়াছেন, আমি তাহাই বলিতেছি মাত্র। ইহা ছাড়াও আপনাদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আছে। আত্মক্ষমতাবোধের মনোভাব আজ আর আমাদের দেশবাসীর নাই। কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতার মনোভাবই আজ তাহাদের মধ্যে বর্তমান। সমর পরিচালনের পক্ষপাতী প্রার্থী যোগ্যতম উপনির্বাচনে শতকরা ৯৪টি করিয়া ভোট পাইয়াছেন। অবশিষ্ট ভোটগুলি শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী প্রার্থীরা পান। উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া সৈন্যদলে যোগদান হইতে রেহাই পাইবার দাবি উত্থাপনের হারও ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। প্রথমে উহার হার শতকরা ২ জন করিয়া ছিল এক্ষণে উহা দাঁড়াইয়াছে শতকরা এক ভাগেরও এক-তৃতীয়াংশ। এমনকি জনসাধারণের মধ্যে নিতান্ত রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত সম্প্রদায়ও এক্ষণে উপলব্ধি করিতেছেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে আমাদের এবং অর্ধবিশ্ববাসীর দাসত্ব বরণ করা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না।

আমাদের মধ্যে যাহারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল (আমাদের মধ্যে অনেকেই এরূপ) তাহারা আমাদের চতুর্দিকে দুঃখদুর্দিন ঘনাইয়া আসা সত্ত্বেও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছেন। আমরা তোষণনীতিকে ঘৃণা করি। কারণ আমাদের ধারণা যে এই নীতি অপরিণামদর্শী, স্বার্থপর ও অনুদার। আপনাদের অনুসৃত নীতি সম্পর্কেও আমরা অনুরূপ মনোভাব পোষণ করি। এই নীতি যে আমাদিগকে কিরূপ অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে তাহা আমরা পূর্ব হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। চীন, আবিসিনিয়া, স্পেন ও চেকোশ্লোভাকিয়া এই নীতি দ্বারা সংক্রামিত হইলেও আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইয়াছিলাম। আমাদের দেশের কথা ভাবিয়া আমরা লজ্জিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমরা আর লজ্জা অনুভব করি না, পরন্তু অত্যন্ত গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমাদের ধারণা এই যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া যদি কিছু থাকে, ব্রিটেন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। তথাপি যাহাতে পূর্বেকার ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়, তজ্জন্য আমরা সব সময়ই সজাগ ও সতর্ক রহিয়াছি। জয়লাভ হইলে এরূপ আশঙ্কা অধিকতর ঘনীভূত হইবে। তখন আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে এবং আমাদের মধ্যে যাহারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, শ্রেণীগত স্বার্থপরতা ও জাতিগত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাদিগকে আমরা সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। ভারতে এরূপ ঘটিতে পারে। অসহযোগ আন্দোলনের দরুনই এরূপ ঘটার সম্ভাবনা অধিক। যাহারা জয়লাভের পথে সাহায্য না করিয়া বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ কোনক্রমেই তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইবে না। যুদ্ধের ফলাফল যদি অনুরূপ হয়, তাহা হইলেও এমন কি উহার

উপর মিঃ স্ট্যালিনের হাত থাকিলেও আক্রমণকারীদের নিকট হইতে বেশী কিছু প্রত্যাশা করিবার থাকিবে না। কারণ 'স্বাধীনতা' কথাটি মিঃ স্ট্যালিনের প্রিয় নহে। বেশী দেরি হইয়া গিয়াছে কি? আমরা জানি যে, আপনাদের মধ্যে অনেক অসহযোগী যে আন্দোলন চালাইতেছে (এমন কি আপনারা তাহাদের মধ্যে থাকিলেও) তাহার ফলে সুখী হইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন না। ভারতে 'সিন্‌ফিন' নীতি প্রবর্তনে আপনারা সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না কিংবা ভারতে উহা কার্যকরী হইলে যে অবস্থা হইবে, তাহাতেও আপনারা সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। আমাদের ন্যায় আপনাদিগকেও বিবেক-বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং আপনারা ও আপনাদের নেতৃবৃন্দ অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন কিনা দেখিতে হইবে। আপনারা বাস্তবতার দিক হতে এরূপ চেষ্টা করিতেছেন কি? শুধু আদর্শের দিক দেখিলে চলিবে না, কারণ আপনারা আপনাদের কর্তব্যকে যে রূপ দিয়াছেন, ইংরেজ ও অন্যান্য ভারতীয়েরা উহা সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দেখিলে আদর্শ অনুযায়ী সমস্যার সমাধান হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। অন্যান্যদের বর্তমান অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়াই কার্যত কিরূপভাবে সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান হইতে পারে, তাহা আপনারা চেষ্টা করিয়াছেন কি? অধিকার দান ও আপসরফার প্রস্তাবে আপনাদের অংশগ্রহণ করিতে আপনারা রাজী আছেন কি? যদি বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে, অন্ততপক্ষে সাময়িক ভাবেই বশ্যতা স্বীকারের দায়িত্ব বৃটিশের উপর নির্ভর না করিয়া আপনাদের উপরই নির্ভর করিবে; কারণ সমগ্র পৃথিবীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট একটা বিরাট দায়িত্ব বৃটেনকে বহন করিতে হইতেছে এবং উহা ব্যর্থ হইলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আশাও বিনষ্ট হইবে। এই মহাবিপদের সময় আপনারা কি সেই পুরাতন এবং এখন বর্তমান অভাব-অভিযোগ, অন্যায়-বিচারের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য আমাদের ও অন্যান্য ভারতীয়দের হাতে হাত মিলাইতে পারিবেন না? এতদ্দ্বারা আপনারা শুধু ভারতকে নহে, পরন্তু সমগ্র পৃথিবী রক্ষায় সাহায্য করিবেন এবং পরে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকল্পে ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে আপনারা আপনাদের এই সাহায্যপুষ্ট দাবি উপস্থিত করিবেন। —ইতি,

আপনাদের বিশ্বস্ত
ইলিনর-ই-র‍্যাথবোন

মিস র‍্যাথবোনের এই 'খোলা-চিঠি'খানি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা ও নিন্দাবাদ শুরু হয়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ৩১ মে ১৯৪১ তারিখের প্রধান সম্পাদকীয়তে মিস র‍্যাথবোনের অভিযোগের ও যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে মন্তব্য করেন ঃ

"মিস র‍্যাথবোনের যুক্তির এই ধারা আমাদের বিস্মিত করিতে পারে নাই। কারণ তাঁহারও চেয়ে অনেক বড় চিন্তাশীল লেখকরূপে যাঁহারা প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও অনেককে এই যুদ্ধের দুর্যোগে পড়িয়া প্রচার-পুস্তিকা রচনায় ব্রতী হইতে দেখা যাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যর নর্মান এঞ্জেলের নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার মত ব্যক্তিও যদি ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না-দেওয়ার পক্ষে ওকালতি করিয়া আমেরিকার কাগজে প্রবন্ধ রচনা করিবার উৎসাহ বোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে মিস র‍্যাথবোন যে তাঁহার 'ভারতীয় বন্ধুদের' নিকট খোলা-চিঠি ছাড়িবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে?......

"তাঁহার প্রশ্নগুলির মধ্যে বড় প্রশ্ন এই যে, কেন কংগ্রেস বৃটেনের সমর-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতেছে না। কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা এবং স্বয়ং মহাত্মাজীও বহুবার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। মিস র‍্যাথবোনের জানা উচিত ছিল যে, অনেক দ্বিধা ও অনেক ইতস্তত করার পর বৃটেনের সদিচ্ছা সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়াই কংগ্রেস সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়াছে। ইহার জন্য কংগ্রেসের চেয়ে বৃটিশ নীতিই অধিক পরিমাণে দায়ী।"...

মিস্ র‍্যাথবোনের 'খোলাচিঠি'খানি যেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখনও অসুস্থ। রোগশয্যায় থাকা সত্ত্বেও মহাযুদ্ধের এবং দেশের খবরাখবরের জন্য আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। সব খবরই তাঁকে পড়ে শোনাতে হত। মিস্ র‍্যাথবোনের ধৃষ্টতা ও দম্ভোক্তিপূর্ণ চিঠিখানি শোনান হলে কবি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান।

সম্ভবত আরও কয়েকটি ঘটনা বা সংবাদও কবির মনে গভীর বেদনা ও উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। 'দেউলী' বন্দীশিবিরে এবং দেশের বিভিন্ন জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে সংবাদপত্রে বেশ কিছুকাল ধরেই সমালোচনা হচ্ছিল। এমন কি জওহরলালের মত নেতার বিরুদ্ধেও এবার অকারণে কড়াকড়ি বা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, যার জন্য পার্লামেণ্টে ভারতসচিব স্বয়ং আমেরীকে এই প্রশ্নের (শ্রমিক দল সদস্য সোরেন্সেন'এর) জবাবদিহি করতে হয়। যেদিন সংবাদপত্রে মিস্ র‍্যাথবোনের খোলাচিঠিখানি প্রকাশিত হয়, সেই দিনই পার্লামেণ্টের এই প্রশ্নোত্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে 'রয়টর'এর সংবাদদাতা লিখলেন (লণ্ডন ২৯ মে '৪১; দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা-১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ॥ ৩০ মে, '৪১) ঃ

"অদ্য কমন্সসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব মিঃ আমেরী জানুয়ারী হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উপর অধিকতর কড়া ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া মিঃ সোরেন্সেন যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। মিঃ আমেরী উক্ত প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিলে পর মিঃ সোরেন্সেন জিজ্ঞাসা করেন যে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর খারাপ ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া যদি সাক্ষ্য প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেন তাহা হইলে মিঃ আমেরী তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কিনা। উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন, 'আমি উক্ত মর্মে একটি বিবৃতি দেখিয়াছি ও তদন্ত করিয়াছি।"

এ ছাড়া বোম্বাই ও ঢাকার দাঙ্গার বীভৎস ও রোমহর্ষক বিবরণও প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু যে জিনিসটা তাঁকে সবচাইতে পীড়িত ও বিচলিত করেছিল তা হল মিস্ র‍্যাথবোনের খোলাচিঠিতে জওহরলালের উদ্দেশে বার বার শ্লেষ ও বক্রোক্তি। বস্তুত তাঁর খোলাচিঠিখানি প্রধানত জওহরলালের উদ্দেশে লেখা, ঠিক সেই সময়ে যখন নাকি তিনি কারারুদ্ধ এবং মহিলাটি ভালো করেই জানতেন, কারা বলপূর্বক তার কণ্ঠরোধ করেছেন। তাছাড়া ব্রিটিশ রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবী এবং রাষ্ট্রনায়করা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে এতকাল যে-সব সমালোচনা ও অভিযোগ করে আসছিলেন, মিস্ র‍্যাথবোন তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। শুধু শ্লেষ, বক্রোক্তি ও অভিযোগ এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ ও অবমাননা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি,—ভারতবাসীর উদ্দেশে তিনি একটা প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়েছিলেন।

এ সবের ফলে মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠিখানি কবির মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনার সঞ্চার করে। জাতির চরিত্রের অনেক দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতার সম্পর্কে কবি খুবই সচেতন ছিলেন—আর পরাধীনতাই যে তার মূল কারণ তাও তিনি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কোন দাম্ভিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মুখে জাতির নিন্দাবাদ ও অবমাননা তিনি কোনোদিনও সহ্য করেন নি—এখনও করতে পারলেন না। রোগজীর্ণ শরীরে অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করেই কবি লাঞ্ছিত স্বদেশবাসীর পক্ষে

মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠির প্রতিবাদে এক দীর্ঘ খোলা-চিঠি প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্বহস্তে লিখতে পারেননি, রোগশয্যা থেকে কবি মুখে মুখে বলে গেলে কৃষ্ণ কৃপালনী সেটি লিখে নেন। চিঠিখানি ঠিক কোন তারিখে মুসাবিদা করা হয়েছিল তা জানা যায় না। সম্ভবত জুন মাসে ২ ও ৩ তারিখ নাগাদ মুসাবিদা এবং পরে সেই মুসাবিদা কবি কর্তৃক পরিমার্জিত ও অনুমোদিত হলে ৪ জুন সেটি প্রকাশের জন্য 'অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস্'কে দেওয়া হয়। পরদিন ৫ জুন ১৯৪১ দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়। ৬ জুন কবি রামানন্দবাবুকে এক পত্রে লেখেন ঃ

"মিস্ র‍্যাথবোনকে যে চিঠি লিখেছি তার তর্জমা বোধ হয় হাবুলকে দিলে তিনি ভালো রকমে করতে পারবেন। আমার পক্ষে মন দেওয়া দুঃসাধ্য।"

সুতরাং মূলচিঠিখানি যে ইংরেজিতেই লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই ঐতিহাসিক 'খোলাচিঠি'খানির তর্জমা বিভিন্ন বাংলা দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তর্জমাটি ছিল এই ঃ

"ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস্ র‍্যাথবোনের 'খোলা-চিঠি' পড়িয়া আমি গভীর বেদনা বোধ করিয়াছি। মিস্ র‍্যাথবোন কে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি ধরিয়া লইতেছি, তিনি এই চিঠিতে, 'সদুদ্দেশ্যশালী' সাধারণ ব্রিটেনবাসীর মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই পত্র প্রধানত জবাহরলালের উদ্দেশেই লিখিত এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস্ র‍্যাথবোনের দেশবাসীগণ আজ যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারা-প্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তিনিই মিসের অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য ও সতেজ উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগশয্যা হইতেও, এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে।

"মহিলাটি আমাদের বিবেকের প্রতি অবিবেচনা এবং বস্তুত ধৃষ্টতার সহিত, যে স্পর্ধিত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসীদের অভীষ্ট সিদ্ধির কোনোও সাহায্য হয় নাই। 'ব্রিটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বারি পান করিয়াও" গরিব স্বদেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনও করি, আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস্ র‍্যাথবোন লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্তম ঐতিহ্যের প্রতীক, ততটুকু হইতে আমরা বাস্তবিক বহু শিক্ষালাভ করিয়াছি। কিন্তু একথাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই শিক্ষা হইতে লাভবান হইয়াছেন, আমাদিগকে অপশিক্ষিত করিবার সর্বপ্রকার সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাঁহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। অন্য যে কোনো ইউরোপীয় ভাষার সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্য জাতি কি সভ্যতার আলোকের জন্য ইংরেজদের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল? আমাদের যে সকল তথাকথিত ইংরেজ বন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি আমাদের 'শিক্ষাদান' না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতে ব্রিটেনের সরকারী শিক্ষার প্রণালী বাহিয়া যাহা আমাদের সন্তানগণের নিকটে পৌঁছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ। তাহাতে তাহারা তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজি ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে 'সেই ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বারি পান করিবার ফলে' দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখনপঠনক্ষম (literate) হইয়াছে। অন্যদিকে, রাশিয়ার মাত্র ১৫ বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩২ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের শতকরা ৯৮টি বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (এই সংখ্যাগুলি ইংরেজ-প্রকাশিত 'স্টেটসম্যান ইয়ার বুক' হইতে উদ্ধৃত। ঐ বহির রাশিয়ার অনুকূলে পক্ষপাত ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।)

"এই তথাকথিত সংস্কৃতির চেয়ে আজ জীবনধারণের সম্বল চাই আগে। জীবনোপায়ের ভিত্তির উপরই জ্ঞানালোক -দানের নিমিত্ত শিক্ষায়তন নির্মিত হইতে পারে।

"আমাদের দেশের টাকার থলি দুই শতাব্দীকাল দৃঢ়মুষ্টিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে, তাঁহারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নের জন্য ক্রন্দন করিতেছে। আমি পল্লী-নারীদিগকে কয়েক ফোঁটা জলের জন্য কাদা খুঁড়িতে দেখিয়াছি,—কেননা ভারতের গ্রামে পাঠশালা হইতেও কূপ বিরল। আমি জানি যে ইংলণ্ডের লোক আজ দুর্ভিক্ষের দ্বারে উপস্থিত। আমি তাহাদের জন্য ব্যথিত। কিন্তু যখন দেখি যে, খাদ্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবহরের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা হইতেছে এবং যখন এমন অবস্থাও মনে পড়ে যে, এদেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে অথচ পাশের জেলা হইতে এক গাড়ি খাদ্যও তাহাদের দ্বারে পৌঁছিতে দেখি না, তখন আমি বিলাতের ইংরেজ এবং ভারতের ইংরেজের মধ্যে একটা পার্থক্য না দেখিয়া থাকিতে পারি না।

"ব্রিটিশরাজ আমাদিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে 'আইন ও শৃংখলা' রক্ষা করিয়াছেন, এই জন্যই কি তবে আমরা ইংরেজদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, দেশের সর্বত্র দাঙ্গার উদ্দাম প্রাদুর্ভাব চলিতেছে যখন কুড়িতে কুড়িতে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান ইংরেজের অস্ত্র তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত নড়িতেছেও না, তখন কিন্তু পরপার হইতে ইংরেজরা চিৎকার করিয়া আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, তোমরা তোমাদের ঘর সামলাইতে পার না।

"ইতিহাসে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই যে, সশস্ত্র যোদ্ধারাও ভয়ে প্রবলতর শক্তির সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধেও এমন অবস্থা দেখা গিয়াছে যে, বীরশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, ফরাসী এবং গ্রীক সৈন্যগণও প্রবলতর অস্ত্রশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া ইয়োরোপের রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যখন আমাদের দেশের দরিদ্র, নিরস্ত্র অসহায় কৃষক, রোরুদ্যমান শিশুর ভারে ভারাক্রান্ত কৃষক, সশস্ত্র গুণ্ডার আক্রমণ হইতে ঘরবাড়ি রক্ষা করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, তখন বোধ হয় ইংরেজ রাজপুরুষগণ আমাদের কাপুরুষতা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসেন। ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক তাহার ঘরবাড়ি শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ফতোয়া জারি করিয়া লাঠিচালনা-শিক্ষা পর্যন্ত নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চিরকাল সন্ত্রস্ত এবং তাহাদের সশস্ত্র প্রভুদের কৃপার উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার জন্য আমাদের দেশের লোকদিগকে ইচ্ছা করিয়াই নিরস্ত্র ও পৌরুষহীন করিয়া রাখা হইয়াছে।

"এতকাল ইংরেজ পৃথিবীব্যাপী যে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে,

আজ নাৎসীরা তাহাকে সেই প্রভুত্বের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে স্পর্ধিত আহ্বান করিয়াছে বলিয়াই ইংরেজ নাৎসীদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, কিন্তু মিস্ র‍্যাথবোন আশা করেন যে, আমরা প্রণতিপূর্বক তাঁহার দেশের লোকদের হস্তচুম্বন করিব, কেননা তাহাদের সেই হাত আমাদিগের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে। কোন একটা গবর্নমেণ্ট ভাল কি মন্দ বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপাত্রদের মুখের কথা শুনিয়া বিচার করা চলে না, সেই গবর্নমেণ্ট প্রজার কি বাস্তব হিত করিয়াছে তাহা দ্বারাই বিচার করিতে হয়। ইংরেজরা যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা এই জন্য নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতটা এইজন্য যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তুর অছির কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের স্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে। আমার এরূপ মনে করা অনুচিত হইত না যে, ভদ্রগোছ ইংরেজরা ভারতীয়দের এই সকল ক্ষতি ও অনিষ্ট মনে রাখিয়া অন্ততপক্ষে নীরব থাকিবেন এবং আমরা যে নিষ্ক্রিয় আছি তজ্জন্য কৃতজ্ঞও থাকিবেন; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের অনিষ্টসাধনের উপর আবার আমাদের অপমানও করিবেন এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন, তাহা একেবারে শালীনতার সকল সীমার বাহিরে।"

[প্রবাসী-আষাঢ়, ১৩৪৮ ॥ পৃঃ ৩৯১-৯২]

রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে এক দারুণ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিকে অভিনন্দিত এবং সেই সঙ্গে মিস র‍্যাথবোনকে ধিক্কার জানিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। Hindusthan Standard-এ (৫ জুন) লেখা হয়:

"It is not necessary to paint the lily and therefore we shall not try to embellish the reply of Srijut Rabindranath Tagore to the 'open letter' of Miss Rathbone. That even from his sick bed Rabindranath has thought it necessary to enter a protest against the indiscreet remarks of Miss Rathbone shows how deeply she has wounded the feeling of India by her injudiciousness. Probably she was gloating in her heart that she had presented an unanswerable case against Indians in her 'open letter'. But as a matter of fact, she only proved her blissful ignorance of things Indian. Whatever might be her intention, there is no doubt that she transgressed truth and was wantonly provoking in her letter. And she made her case worse by administering an open threat to India."

পরদিন ৬ জুন 'রামমোহন লাইব্রেরী হল'এ কলিকাতার নাগরিক ও সুধীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দিত করে তাঁর আরোগ্যলাভ ও দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়। সেই সভায় পৌরোহিত্য করেন স্যার মন্মথনাথ মুখার্জী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ভাষণে কবির সর্বতোমুখী প্রতিভা ও অবদানের জন্য 'ভারত গৌরব' বা 'The Pride of India' আখ্যায় ভূষিত করেন। মিস র‍্যাথবোনের চিঠির সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য ডঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী তাঁর ভাষণে কবিকে অভিনন্দিত করেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অনুরূপা দেবী, ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (মেয়র), মনীন্দ্র সর্বাধিকারী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ডঃ কালিদাস নাগ প্রমুখ বহু সুধীজন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু ৭ জুন '৪১ আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কবিকে এক পত্রে লিখলেন,

"ইতিমধ্যে Miss Rathbone-এর প্রগল্‌ভতার আপনি যে উত্তর দিয়েছেন তা পড়ে মুগ্ধ হলাম। এই মূক অবমানিত, উৎপীড়িত দেশের আপনিই মুখপাত্র, কোটি কোটি ভারতবাসীর তরফ থেকে আপনিই বক্তা। আমাদের অপমানের তো অন্ত নেই—এরই মধ্যে আমাদের আত্মমর্যাদা জাগ্রত ও অক্ষুণ্ণ রাখবার আপনার যে আজীবন সাধনা তা ব্যর্থ হবার নয়।"

কিন্তু দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সুধীজন এই প্রতিবাদ-পত্রের জন্য কবিকে অভিনন্দিত করলেও তখন পর্যন্ত কোনো কংগ্রেস নেতাকে তা করতে দেখা যায় না। রোগশয্যা থেকেও এই অশীতিপর বৃদ্ধ কবি যে সমগ্র দেশ ও জাতির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে একটা মস্ত বড়ো কাজ করেছেন—কবির কাছে এমন একটা তারিফসূচক কোনো পত্রও কোনো রাজনৈতিক নেতাকে লিখতে দেখা যায় না। স্মরণ রাখা দরকার, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল প্রমুখ নেতারা কারাগারে থাকলেও গান্ধীজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ প্রথম সারির কিছু কংগ্রেস নেতাকে তখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করা হয় নি। কিন্তু তাঁদের কাকেও মিস র‍্যাথবোনের চিঠির প্রতিবাদে কিছু বলতে বা মন্তব্য করতে দেখা যায় না। অথচ মিস র‍্যাথবোন তাঁর পত্রে সরাসরি জওহরলালকেই আক্রমণ করেছিলেন—আর সে কারণেই যেসব দায়িত্বশীল নেতা [illegible] ছিলেন তাঁদের 'পরে তার প্রতিবাদ করার একটা দায়িত্বও বর্তেছিল। অথচ ইতিপূর্বে, বিশেষত যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে, গান্ধীজী বহু অখ্যাত ব্রিটিশ এবং মার্কিন সাংবাদিকদের অনেক ধৃষ্ট প্রশ্ন ও সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন। যদি গান্ধীজী কিংবা রাজেন্দ্রপ্রসাদ মিস্ র‍্যাথবোনের এ প্রগল্‌ভতার সমুচিত জবাব দিতেন, তা হলে অসুস্থ কবিকে আর এতখানি ক্লেশ স্বীকার করে ঐ দীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র লিখতে হত না। মনে হয়, কংগ্রেস নেতারা কেউ কিছু বললেন না দেখেই কবি শেষ পর্যন্ত সে দায়িত্ব নিজ স্কন্ধেই তুলে নিলেন।

রবীন্দ্রকাব্যে পালাবদল/ মানুষের সম্পর্কে

ক্ষুদিরাম দাশ

এই আধুনিক গীতি-মহাকবির সূক্ষ্ম অথচ ব্যাপক কবিকল্পনায় নিসর্গপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য যেমন ধরা দিয়েছে, তেমনি সাড়া জাগিয়েছে ভারতীয় মানুষ-জীবনের চলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নৈরাশ্য থেকে অভ্যুদয়ের বিজয়বার্তা ও পথনির্দেশ। মহাকবিরা তাঁদের প্রায় অজ্ঞাতেই ভাবীকালের জাতীয় জীবনের ভূমিকা রচনা করে যান, রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন, এজন্য তিনি আমাদের সম্ভাবনাময় জাতীয় জীবনের মহাকবি। কেবলমাত্র নিসর্গ-সৌন্দর্যের রহস্যময় ইন্দ্রজাল রচনায় মহাকবিত্ব-সিদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ।

তাঁর গতিশীল কাব্যজীবনের দিকে লক্ষ্যপাত করলে দেখা যায় সুদূরচারী স্বপ্ন ও আবেগ নিয়ে এর যাত্রা, অকারণ বিরহ-বিকার এর কেন্দ্রবিন্দু, নিসর্গ-সৌন্দর্য-বিলাস এর পরিমিতি, ব্যক্তিগত বিচিত্র বাসনা হল এর দিগন্ত-প্রসার। এককথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ প্রবল রোম্যান্টিক মনোভাব নিয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর বিশিষ্ট কবিস্বভাব বিন্দুমাত্র রক্ষণশীল বা স্থাবর-প্রকৃতির ছিল না, ছিল একান্তভাবেই চলিষ্ণু, সেইজন্য সাধারণ প্রকৃতি-প্রীতিকে অতিক্রম করে পরিবর্তনময় প্রবাহের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ, ঋতু-পর্যায়ের আবৃত্তির মধ্যে জীবনের চিরনবীনতার সংকেত, সাম্প্রতিক পারমাণবিক আবিষ্কার ও মহাকাশ-গবেষণার সঙ্গে কবিকল্পনাগত সত্যের সামঞ্জস্য অনুভব—এসব যেমন তাঁর কবিতায় ও গানে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অভিভূত হয়েই দেখতে হয় রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানের প্রভাবে বিবর্তিত সমাজ-জীবনের অগ্রগতির সপক্ষতা, আর এরই সূত্রে কর্মী মেহনতি মানুষের ত্যাগ ও বীরত্বের মহিমা উপলব্ধি।

বস্তুত কবি রমণীয় সৌন্দর্যের ও শব্দ বিন্যাসে মায়া সৃজনে অদ্বিতীয় হলেও চলিষ্ণু ও সংগ্রামী মানুষের দুঃখময় জীবন সংঘাতেরও নিয়ত সঙ্গী হয়েছেন—হয় কাব্যে ও নাট্যে, নয় প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, কর্মে ও নানান্ বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে। কবির উল্লিখিত দুই পৃথক্ মনোভঙ্গির বিবর্তনের একটি লেখচিত্র অর্থাৎ গ্রাফ্ যদি এঁকে দেখানো যায়, তাহলে প্রায় গাণিতিকভাবে ধরা যেতে পারে যে সৌন্দর্যবিলাসের রেখাটি প্রথম কাব্যজীবনে যে-পরিমাণ সমুন্নতি-অঙ্কে, মধ্যজীবনের পর থেকে মানবসমাজ-সপক্ষতা ক্রমশ সেই পরিমাণই শীর্ষে উঠে গেছে। প্রথম কাব্যজীবনে অর্থাৎ সোনার-তরী, চিত্রা, কল্পনা, খেয়া প্রভৃতি রচনাকালে মানুষ-প্রীতি ও সমাজ-নিষ্ঠা কবিকল্পনায় গৌণ এবং নিসর্গরেখার বেশ নিম্নে, যদিচ দুএকটি ক্ষেত্রে একালেও সমাজভাবনার উন্নত দৃষ্টান্ত দেখা যায় (যেমন "এবার ফিরাও মোরে" কবিতা), কিন্তু লেখচিত্রের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ মহাযুদ্ধোত্তর বলাকা, মুক্তধারা, রক্তকরবী, মহুয়া, চণ্ডালিকা, কালের যাত্রা, তাসের দেশ প্রভৃতি থেকে পুনশ্চ, পত্রপুট, জন্মদিনে পর্যন্ত রচনায় কেবল প্রকৃতির প্রতাপ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, বরং বেজে উঠেছে মানুষেরই জীবনযাত্রার সংকেত, আর এই মানুষ অবিরাম নতুন পথের যাত্রী, এই মানুষ নিতান্ত সাধারণ অবহেলিত শীর্ণ মানুষ—বিবেকানন্দের ভাষায় ভারতের চলমান শ্মশান। শুধু তাই নয় একালেও কবিচিত্তে প্রকৃতির আধিপত্য যেখানে রয়েছে এমন ফাল্গুনী, নবীন, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুনাট্যেও ব্যঞ্জিত হয়েছে মানুষেরই উত্থান-পতন-বন্ধুর পথে অবিশ্রান্ত চলার জয়ধ্বনি।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে, যেখানে কুহেলীমুক্ত স্পষ্ট ভাষায় কবি যুক্তি ও অনুজ্ঞার পথবর্তী হয়েছেন এমন প্রত্যক্ষ মানবিকতার দৃষ্টান্ত এই দ্বিতীয়ার্ধে প্রচুর। হিন্দু-মুসলিম মিলন-সম্পর্ক গড়ে তোলার আগ্রহ, অশিক্ষা ও অনাহারে নিপীড়িত অনুন্নত সম্প্রদায়ের শৃঙ্খল-মোচন ও গ্রাম-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লেখা কালান্তরের প্রবন্ধাবলী, রাশিয়ার চিঠি, সমবায়, পল্লীপ্রকৃতি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গদ্যে রচনার সঙ্গে কবিতাবলী মিলিয়ে নিয়ে বলা যায়

কবির সমাজভাবনা কেবল ভাববাষ্পাকুল ছিল না, নিঃশেষে ধ্রুব এবং প্রত্যক্ষভাবে আন্তরিকই ছিল। আবার এরই সঙ্গে কবির কর্মের উদ্‌যোগকে—প্রথম অধ্যায়ে শিলাইদহ-পতিসরে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীনিকেতন—যদি মিলিয়ে নেওয়া যায় তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর প্রাকৃতিক রহস্যস্বপ্ন বাস্তব মানবিকতায় লীন হয়ে চরিতার্থ হয়েছে। এ কবি যথার্থই ক্রান্তদর্শী, দেশ ও জাতির উন্নয়ন-প্রয়াসে সুচিরকাল স্মরণীয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কবির এই একান্ত মানুষ-সপক্ষতার দিকটি বহুকাল উপেক্ষিত থেকে গেছে, দীর্ঘকালের পরাধীনতা ও শ্রেণী-স্বার্থের সংস্কার আমাদের চিত্তেন্দ্রিয়কায় এতই অসুস্থ ও সংকীর্ণ করে তুলেছিল যে আমরা তাঁর স্বপ্ন রচনাতেই মোহাবিষ্ট ও সুখী ছিলাম। যেখানে কাব্যার্থ ধরতে পারিনি সেখানে এই মনে করে আত্মতুষ্টির সন্ধান করেছিলাম যে, কবি উপনিষদের বাণীগুলি পুনরায় বলছেন এবং সর্বত্র ঈশ্বরের দিকেই অঙ্গুলিসংকেত করছেন। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাঁর সমাজমুখিতার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমাদের পরমপ্রিয় শান্তি অহিংসা রক্ষণশীলতা এবং কপট ঈশ্বরপ্রীতির রঙে ডুবিয়ে মনগড়া এক ঋষিকে প্রতিষ্ঠিত করেছি জীবনমুখী যথার্থ কবির জায়গায়। সুখের বিষয় এই ধরণের অবুদ্ধি ও কপটতা-বিজড়িত স্বপ্নমোহের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আজকের কালান্তরে কবি তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবিচিত্তে স্বদেশীয় মানুষসমাজের অভিঘাত সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে নিতে ক্ষতি নেই।

কবিচিত্তের প্রথম পরিস্ফুট স্বপ্নমুক্তি ঘটেছিল তিরিশোত্তর বয়ঃক্রমে, বিখ্যাত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। তার আগে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অবস্থায় অপ্রকাশের বেদনার সঙ্গে হয়তো বা সামাজিক অবরুদ্ধতার অনুভবের যোগ ছিল 'ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্'—এইরকম প্রবল প্রতিবাদী উচ্চকণ্ঠ তার প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু 'এবার ফিরাও মোরে' একালকার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-আসক্তির অবসরে একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। কবিতাটি তখনকার বিপ্লবী-দের কী পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হয়তো সকলেরই জানা। কিন্তু যে-অসহায়তার করুণ ছবি কবিকে এ ধরণের বৈপ্লবিক আক্ষেপ ও উৎসাহের বাণীপ্রকাশে অনুপ্রেরিত করেছিল তা হয়তো অনেকের জানা নেই। তা হল জোতদার-জমিদার-মহাজন-কবলিত ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের জীবনধারা। এর ছবি ফুটেছে ঐ কবিতায় নিচের পঙক্তিগুলিতে—'স্কন্ধে যত চাপে ভার / বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার / তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি / নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি / মানবেরে নাহি দেয় দোষ,'—ইত্যাদি। এই ছবি কল্পনাপ্রবণ কবিকে স্বল্প পরেই গ্রাম-উন্নয়নের ও দরিদ্র কৃষকদের পরিত্রাণের কাজে নিয়োজিত করেছে। কবি এই মূঢ় মূক শোষিত জনতাকে কী পরিমাণ ভালোবেসেছিলেন তার পরিচয় রেখেছেন একালকার "ছিন্নপত্রাবলী"তে—"আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো—নিরুপায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই......সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ বড়ো হতভাগ্য!" এবং "আহা, এমন প্রজা আমি দেখিনি—এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে" ইত্যাদি।

কবির শিলাইদহ-বাস এবং মাটি ও মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের প্রভাব তাঁর কাব্যিক পৃথিবীপ্রীতিকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে ('বসুন্ধরা' কবিতা দ্রষ্টব্য)। বলা যেতে পারে, এরকম আশ্চর্য পৃথিবীপ্রীতি কেবল কল্পলোক থেকে নেমে আসে নি, এর পিছনে বাস্তব শক্ত ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার ঐ সহসা-আগত উত্তুঙ্গ বাস্তবতা পরের বেশ কয়েক বছরের মধ্যে আর পুনরাবৃত্ত হয়নি। এখন নিসর্গ-কল্পলোকেরই প্রাধান্য। কেবল 'মালিনী' নাটকে রাজকন্যার জনগণের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়ার প্রবল বাসনায় উক্ত মানবিকতার খানিকটা অনুসৃতি ঘটেছে, আর পরের কাব্য চৈতালির মধ্যে অবহেলিত মানুষের প্রতি করুণার স্বাক্ষরে এসে কবির এ ভাবনা আপাতত নিবৃত্তিলাভ করেছে। হতে পারে যে, পল্লী-স্বরাজ সৃষ্টির চিন্তাভাবনা কাব্যে মানুষ-সম্পর্কিত আবেগকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত ও স্তিমিত করেছে। চার-পাঁচ বছর পরে লেখা কল্পনা-কাব্যের সময়ে ভাবাদর্শের প্রেরণায় কবি "হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস" এবং "শুধু দিন-যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি" প্রভৃতি স্মরণীয় বাণীগ্রন্থন করেছেন। এগুলির মধ্যদিয়ে তখনকার শ্রেণীস্বার্থমগ্ন স্থবির জীবনের প্রতি লক্ষ্য করে কবি তিরস্কার প্রকাশ করেছেন। শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের পার্শ্ববর্তী সাধারণ মানুষের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষা ও আত্মপ্রবণতার গ্লানির দিক কবিচিত্তকে ব্যথিত ও বিদ্রোহী করে তুলেছে। আগে থেকেই কবি গোঁড়া হিন্দুয়ানির ও মেকি স্বদেশীর বিরোধী ছিলেন, ক্রমে যে-কোনো স্বার্থ-সংরক্ষণেরই বিরোধী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু এবং 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে কবিচিত্তে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার প্রবল উদ্বোধন ঘটে। কবি বাস্তব বিভেদ ও সংকীর্ণতার মধ্যে জাতীয়তার কোনো আদর্শরূপ দেখতে না পেয়ে রোম্যান্টিক কল্পনার বশে সাময়িকভাবে প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্র ও বর্ণাশ্রম বন্ধনের মধ্যেই যেন সত্য দেখতে পেলেন। প্রাচীন সাহিত্য এবং উপনিষদ কিছু-কালের জন্য তাঁর চিত্তকে আবিষ্ট করে তুলল। 'যে জীবন ছিল তব তপোবনে / যে জীবন ছিল তব রাজাসনে / মুক্ত দীপ্ত সে মহা-জীবনে / চিত্ত ভরিয়া'—বরণ করার আগ্রহ তিনি প্রকাশ করতে লাগলেন এই সময়কার বেশ কিছু কবিতায়। এই সময় আধুনিক শিক্ষিতের সভ্যতার চেয়ে কল্পিত প্রাচীনের সরল জীবনধারাই তাঁর কাছে অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়েছে। নৈবেদ্যের কবিতাগুচ্ছ এবং উপনিষদের রাজ্যে পলায়নী প্রয়াণও একালে। জাতির শিক্ষার মধ্য দিয়েও ঐরকম আদর্শের একটি স্থায়ী মূর্তি গড়ে তুলতে তাঁর আগ্রহ জাগল। এরই ফলে একই সময়ে শান্তিনিকেতনে কাল্পনিক তপোবন জীবনকে বাস্তবে প্রতষ্ঠা করতে চাইলেন। ফলে কার্যক্ষেত্রে তিনি খানিকটা রক্ষণশীলও হয়ে পড়লেন। তবু এই প্রাচীনের সম্মোহ তাঁর চিত্তে আত্যন্তিক হয়ে রইল না। আশ্রম-বিদ্যালয়ে মন্ত্র, উপাসনা, বর্ণভেদরক্ষার পরীক্ষামূলক ব্যাপার কিছুদিন সোৎসাহে চলল বটে, কিন্তু চলিষ্ণুমনা কবি আন্তরিক যুক্তির উপর নির্ভর করে প্রাচীন অনুসরণের অসারতা বুঝলেন শীঘ্রমধ্যেই। তিনি ফিরলেন। হয়তো দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ মানুষের মুখচ্ছবিই তাঁকে ফেরালো। এরই মধ্যে এল বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব। কবি শৌখিন জীবনকে নিঃশেষে প্রত্যাখ্যান করে দুঃখ, কর্ম ও সংগ্রামের জীবনকে গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন: এল স্বদেশী, আর বইল তাঁর দেশপ্রীতির গানের স্রোত। কিন্তু ভাব-প্রবণ স্বাদেশিকতাতেও কবি স্থায়ী হতে পারলেন না, কারণ দেখলেন দেশের মধ্যেই রয়েছে প্রকান্ড বিভেদ। অপ্রত্যাশিত হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা স্বাদেশিকতার আভ্যন্তরীণ ত্রুটির দিকে তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিলে। উল্লেখযোগ্য 'সুপ্রভাত' কবিতাটি (রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি—) এই দাঙ্গারই প্রতিঘাতে লেখা। কবি দেখলেন ভাবাবেগ-সম্বল আন্দোলনে কোনো ফল হবে না যদি হিন্দুমুসলমান না মেলে।

ঐ কবিতায় তিনি বললেন রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার এই রাহুগ্রাস শাপে বর্ষ হয়েছে। এবার চোখ খুলবে যে, নিম্নবর্ণ কিষাণ-হিন্দু কিষাণ-মুসলমানের উন্নয়নকার্য ছাড়া স্বাদেশিকতার অন্য পথ নেই—'মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে'। উক্ত কবিতায় তিনি জমিদার ও ধনী উচ্চবর্ণকে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ ত্যাগ করার আহবান জানাতে গিয়ে শোষিত অসহায় মানুষের ছবি তুলে ধরলেন—

"তোমার শ্মশান-কিংকরদল দীর্ঘ নিশায় ভুখারি।
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া উঠিছে ফুকারি ফুকারি—"

জমিদার ও জোতদারদের কাছে অবেদন জানালেন—

"অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ 'পরে
খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ, থেকো না থেকো না লুকায়ে।"

কারো অপেক্ষায় না থেকে নিজেই আরম্ভ করলেন জমিদারী-এলাকায় নির্দিষ্ট একটা প্রশাসনিক কাঠামোয় গ্রাম-উন্নয়ন গ্রাম-স্বরাজ প্রবর্তনের প্রয়াস। শিক্ষার জন্য স্কুল, স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসক-উপস্বেষ্টা, ঋণমোচনের জন্য সমবায় ব্যাংক, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সালিশী বিচার প্রভৃতি। এই ছিল তাঁর গঠনমূলক স্বাদেশিকতার পরিকল্পনা। শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলন অনায়াসেই ঘটবে এই ছিল তাঁর আশা। পরে চরকা অসহযোগ প্রভৃতি আন্দোলনের মুখে তাঁকে বারংবার আক্ষেপ করতে শোনা গেছে যে স্বাদেশিকরা এই সংগঠনের পথে এলেন না।

যাই হোক, উপেক্ষিত পল্লীর ও অবহেলিত মানুষের উপর এই কার্যকর দৃষ্টিক্ষেপ তাঁকে প্রাচীনধর্মী কাব্যিক আদর্শপ্রবণতা থেকে সরিয়ে ক্রমে বাস্তবে নিয়ে এসেছে। খেয়া ও গীতাঞ্জলিতে তিনি নতুন করে প্রত্যক্ষ গ্রামীণ নিসর্গের চিত্র রচনায় ফিরে এসেছেন। আর মানুষে মানুষে জাতিবর্ণগত শ্রেণীভেদের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ কামনা করছেন। গোরা উপন্যাসে ধর্মের সংকীর্ণতা ও আচারসর্বস্বতা যে নিতান্ত অসার বস্তু তা কবি দেখিয়েছেন। কিন্তু গীতাঞ্জলির মত কাব্যেও প্রকৃতি থেকে অরূপরহস্য অনুভবের মুহূর্তেও, কবি যে মেহনতি মানুষকে উচ্চে তুলে ধরেছেন (তিনি গেছেন যেথায় মাটি কেটে করছে চাষা চাষ—ইত্যাদি) ও সামাজিক অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এইটিই তাঁর মানবিকতা বিষয়ে বড় কথা। এই সময়কার 'অপমান' কবিতার মতো এতো স্পষ্ট সমাজ বিষয়ে আবিষ্ট কবিতা একালে আর একটিও নেই, বহুপূর্বেকার একমাত্র—'এবার ফিরাও মোরে'। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে গীতাঞ্জলিতে কবি হিসাবে নিতান্ত সহজ হবার অবসরেই মানবিক অসাম্যের জন্য তাঁর সহজবুদ্ধি-প্রসূত এই বেদনাবোধ, যা আরো কয়েকটি গানে পরিস্ফুট। তবু হয়তো কবির এই প্রতিবাদ যেন অসহায়ের বিলাপ, মানুষ স্বহস্তে এই সামাজিক অসাম্য চূর্ণ করবে এমন উদ্দীপনা 'অপমান' কবিতায় দেখা গেল না বলা যেতে পারে, কিন্তু এখানে দেখতে হবে যে ঠিক এই অবসরে এর বেশি প্রত্যাশা করা যায় না। কবিস্বপ্নজাত সেই প্রাচীন তপোবন মহিমার রেশ কিন্তু গীতাঞ্জলিতে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। যেটুকু রয়েছে বিলাতযাত্রার পূর্ব-পত্রে তিনি তা চুকিয়ে দিয়ে গেলেন, এখানকার তুলনায় য়ুরোপীয় জীবনধারায় মানবিক সাম্যের মহিমা স্মরণ করে।

এদেশে সামন্ততান্ত্রিক শাস্ত্র ও প্রথার সহায়তায় দীর্ঘকাল ধরে যে মানুষ-নির্যাতন চলছে কবিচিত্তে তার দাহ কিন্তু 'অপমান' কবিতা লেখাতেই গেল না। লিখলেন 'অচলায়তন' নাটক। অনুন্নত নিম্নবর্ণের জন্য কবির সহানুভূতি কী গভীর তার পরিচায়ক এই নাটকটি। আর লক্ষণীয় এই যে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যদিয়েই কবি এই সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। শোণপাংশু নিম্নবর্ণের সহায়তায় আর্যামির অচলায়তন চুরমার করে সংগ্রামের নায়ক সাবধান করে দিয়েছেন, অচলায়তনের ভিত পুনরায় গাঁথবার চেষ্টা করা হলে তিনি আবার ভাঙবেন—সেই বুঝে গেঁথো। নাটকটি রক্ষণশীলদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গে বিচ্ছুরিত। আর এটি প্রকাশিত হলে কবি রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকায় যে-ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাতেই এর রচনার সার্থকতার প্রমাণ মেলে। দেখা যায়, দেশের এই পরিস্থিতি বৈদেশিক পরাধীনতা থেকেও কবির কাছে গুরুতর বলে মনে হয়েছে। কালান্তরের একটি প্রবন্ধে বলছেন, মানুষ-পেষাইকরা আবহমান কাল থেকে স্থির, নিরেট নিশ্ছিদ্র এই জাঁতাকল কি য়ুরোপের যান্ত্রিকতা থেকে কোনো অংশে খাটো?

কবির য়ুরোপ থেকে ফেরার কিছু পরই এসে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ, যা তাঁর নিসর্গ স্বপ্নে ও প্রাচীন জীবনের প্রতি রক্ষণশীল মোহের উপর তীব্র প্রতিঘাতের সঞ্চার করলে এবং এখন থেকে তাঁর কাব্যে বিশুদ্ধ নিসর্গকে ও সাধারণ মানবপ্রীতিকে সরিয়ে ফেলে প্রত্যক্ষ মানুষ ও সমাজের স্থান করে দিলে। গতি, পরিবর্তন, সংঘাত ও বিজয়ের আশ্বাসে মুখর চলমান মানবসমাজ তাঁর সমস্ত মনোযোগ এখন থেকে আকর্ষণ করলে। তাঁর কাব্যে নাট্যে এখন থেকেই যথার্থ পালাবদল শুরু হয়েছে আর এই সংগ্রামী অধ্যায় স্বাভাবিক পরিণাম লাভ করেছে শোষিত মানুষের জন্য ব্যথিত উদ্বেগে।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় লেখা গীতালির গান ও বলাকার কবিতা। প্রথমের দিকে কবি নিজজীবনে দুঃখ যন্ত্রণের উৎসাহ অনুভব করেছেন, পরে জাতির জীবনে সংগ্রামী মনোভাবের, মরণভয় ত্যাগ করে নতুন জীবনকে স্বীকার করার প্রেরণা বিস্তার করেছেন। বলাকার 'পাড়ি' (মত্তসাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে—) কবিতাটি মহাযুদ্ধ আরম্ভের মাত্র কয়েকদিন পরে লেখা। ফলে তিনি এই যুদ্ধকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখছেন তার পরিচয় এর মধ্যে সহজ ও স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, কবি ইতিহাসের মধ্যদিয়ে মানবজীবনে কার্যকরী শক্তিকে মহাকাল, ইতিহাস বিধাতা, পথের পথিক, খেয়ার নাবিক প্রভৃতিরূপে কল্পনা করেছেন। পূর্বেকার গীতাঞ্জলি প্রভৃতির মধ্যে কবি নিসর্গের সৌন্দর্যের অথবা দুর্যোগের মধ্যদিয়ে এই সত্তার আগমন কল্পনা করেছেন। এই সত্তা কবির রহস্যময় কল্পসত্তা, ঠিক আমাদের বহুপরিচিত ঈশ্বর নয়। 'পাড়ি' কবিতায় এ-কে দুর্যোগের মধ্যদিয়ে অভিযাত্রী নাবিক অর্থাৎ মানব-ইতিহাসের নায়ক হিসাবে কল্পনা করে বলছেন—মানবসমাজের আপাত দুর্যোগ-দুঃখের মধ্যদিয়েই এই ইতিহাস-বিধাতার অনিবার্য সঞ্চরণ প্রত্যক্ষ করা যায়।

মহাযুদ্ধের মাধ্যমে তিনি ঠিক আমাদের সামনে এসে পড়েছেন। ঝড়ের মধ্যে ঐ তাঁর তরী দেখা যাচ্ছে, তুফানের উপর অনায়াসে পাড়ি জমিয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি আসছেন কি জন্য? এর উত্তরে কবি জানাচ্ছেন—মানুষ বহুদিন ধরে লাঞ্ছিত হচ্ছে, উৎপীড়িতের দুঃখের ভার সীমা অতিক্রম করেছে, তাই মুক্তির আশ্বাস নিয়েই তিনি এসেছেন—

সে থাকে এক পথের পাশে অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।

বিশ্বের কাছে এইসব বঞ্চিতের কোনো পরিচয় নেই, নাম নেই। পথের পাশে পড়ে-থাকা এইসব মানুষের দুরবস্থার প্রতীকী চিত্রও কবি দিয়েছেন—

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক-আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি

আশাবাদী কবি ধরেই নিয়েছিলেন যে, এবার একটা ওলট-পালট হবে নিশ্চয়ই, সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্র হটবে এবং মানুষের মুক্তি আসবে। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণে কবি মহাযুদ্ধকে ঐ কারণে অভ্যর্থনা করেছেন দেখা যায়— "ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে। সেইখানে তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙ্‌তে হয়। তবে মুক্তি।...এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে।"

রবীন্দ্রনাথ এরকম বহু ভাষণের মধ্যদিয়ে ("শান্তিনিকেতন" দ্রষ্টব্য) কেবল এই বিশেষ যুদ্ধকেই নয়, প্রকারান্তরে বিপ্লবকেও সমর্থন জানিয়েছেন। আর লক্ষণীয় হল মহাযুদ্ধকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে স্বদেশের মানুষ-নির্যাতনের প্রসঙ্গে কবি এসেছেন এবং তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এই বিভেদের বৈপ্লবিক সমাধানের জন্য দেশবাসীকে উৎসাহিত করেছেন—

"রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়েনি। সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি। অপমানে মাথা হেঁট হয় নি? সইবে না বন্ধন, বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে, সেই প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে।......আমরা এ দেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে তুলছি।......ইতিহাস বিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না। মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না?"

কবি নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে-বিপ্লবের কথা বলছেন তার মধ্যে ভাগ্যবিধাতার প্রসঙ্গ তুললেও একথা তো অস্পষ্ট থাকছে না যে মানুষের মধ্যদিয়েই সে প্রেরণা কার্যকরী হবে। বস্তুত কবি স্বকীয়ভাবে ইতিহাস বিধাতার সত্তায় বিশ্বাসী। তাই তিনি ঐভাবেই কথা বলেছেন।

বলাকার কবিতানিচয়ের সংগ্রামী জীবনকে অভিনন্দন, দুঃখ-পথের যাত্রী মানুষের জীবনের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত, সেজন্য এ নিয়ে আমরা কালক্ষেপ করতে চাই না। কিন্তু পরবর্তী 'মহুয়া' কাব্যের মুখ্য কবিতাগুলির সম্বন্ধে দু-চার কথা না বললেই নয়। 'মহুয়া' একালের প্রেম-কবিতার সংকলন। কিন্তু এ প্রেম নিতান্ত বিশিষ্ট, অপ্রত্যাশিত বিস্ময়করভাবে নতুন। বিলাসী জীবনের সুপরিচিত এবং আমাদের বহু-অভিলষিত সেই পুরাতন সংকীর্ণ গোপন প্রণয় এ নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ধূলি ধূসরিত অথচ সেইভাবে মহিমান্বিত একটি নতুন রূপ দেখিয়ে চির-আধুনিক কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বলাবাহুল্য, বলাকায় উপলব্ধ কবির বৈপ্লবিক জীবনবোধই মহুয়ার প্রেমকে বৈপ্লবিক নতুনত্ব দিয়েছে। মহুয়ার প্রণয়িনী প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন 'ক্ষুব্ধ-সিন্ধুতীরে'। আর চিরাচরিত গোপন মিলন-বিলাস ত্যাগ করে দুর্গম দুঃখের পথে প্রেমিকের সঙ্গে চলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন—যাবনা বাসরকক্ষে বাজায়ে কিঙ্কিণী বা আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিণী। উভয়ে প্রতিজ্ঞা করছেন—আমরা দু'জনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে বা মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে বা পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে বা বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে। মহুয়ার বসন্ত প্রাচীন সঞ্চিত সংস্কারকে ধিক্কার দিয়ে, পুরাতনকে ভাঙ্‌বার মন্ত্র নিয়ে (আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে) প্রেমিকের সামনে সমুপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু মহাযুদ্ধের অভিঘাতে কবির দৃষ্টি কেবল ভাবজগতে নিলীন রইল না, বাস্তবের ধূলা-মাটিও প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করলে। কবি নিপীড়িত জনতা, বিশেষে মেহনতী মানুষের দিকে আকৃষ্ট হলেন। পিছনের পটভূমিতে রইল নিসর্গ, সামনে এগিয়ে এল মানুষ—অর্ধাশিত কঙ্কালসার মাটির কাছের মানুষ। আঁকলেন রাষ্ট্রিক অত্যাচারের ছবি মুক্তধারায়, আর ধনতান্ত্রিক শোষণের একটি বেদনাকরুণ দলিল তৈরি করলেন—রক্তকরবী। আধুনিক রাষ্ট্র যন্ত্রবিজ্ঞানের সহায়তায় শক্তিমান হয়ে অধিকৃত দেশে পণ্যের হাট বসাচ্ছে, যন্ত্রশক্তিহীন মানুষকে দাসত্বে বন্ধ করছে। বিগত যুদ্ধে য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কূটকৌশলী মানুষ-নির্যাতনের স্বরূপদৃষ্টে মুক্তধারায় এই জঘন্য অসভ্যতার আভাসমাত্র কবি দিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে জানতেন যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পিছনে রয়েছে ধনতান্ত্রিক প্রয়োজন ('লড়াইয়ের মূল'—কালান্তর), আবার তারও পিছনে রয়েছে একটা জঘন্য প্রবৃত্তি—লোভ। ধনতান্ত্রিকতার নির্লজ্জ স্বভাব দেখে এবং মানুষনিপীড়ন দেখে কবি উপলব্ধি করেছিলেন, নিজকৃত জটিলজালে আবদ্ধ হয়ে এ পাপটা আত্মহনন করবে, আবার শ্রমিক-বিপ্লবও সেই অপমৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। আমরা রক্তকরবীর কথা বলছি। এ নাটকে সাংকেতিকতা থাকলেও কারখানার বাস্তব পরিস্থিতির চিত্রেরও কিছুমাত্র অভাব নেই। সব থেকে উল্লেখযোগ্য যন্ত্রসংস্কারে বিমূঢ়

শ্রমিকদের মানসিক অবস্থা। তারা পুনঃপুনঃ পৌষের ফসলের ও মুক্তির ডাক শুনেও সাড়া দিচ্ছে না, বরং প্রতিরোধের আয়োজন করছে। কিন্তু অবশেষে বহু সংঘাতের পর অধিকাংশের চৈতন্য জাগল, তারা দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহই করলে। এরই সঙ্গে কবি দেখাচ্ছেন মিলের মালিকও স্বর্ণজালে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে পরিশেষে জাল ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে এসে মেহনতী মানুষের মুক্তির সঙ্গে যোগ দিলে। রক্তকরবীর এই অংশটুকুতেই কবির কল্পনা ও আদর্শবাদ। মালিক তার কারখানা ভেঙে ফেলছে এর ইতিহাসের নজির কবি রবার্ট ওয়েনের দৃষ্টান্ত থেকে পেয়েছিলেন হয়ত বা। তবু এর মধ্যে কবিসুলভ ভাবাদর্শও রয়েছে যথেষ্ট। আর এটুকু না থাকলে রক্তকরবী শ্রেণী-সংঘর্ষের বাস্তব নাটকই হয়ে পড়ত। রক্তকরবীতে যা ধ্বংসের মধ্যে প্রতীয়মান এবং সমস্যা হিসেবে যার এলাকা বিশ্বব্যাপী, তারই স্বাদেশিক ও গঠনমূলক রূপ কবি দেখালেন 'রথের রশি' বা 'কালের যাত্রা' নাটিকায় স্বল্প পরেই। দেখালেন এ দেশের নিম্নবর্ণ, যারা মেহনতীও, তারা রাষ্ট্রের সহযোগী না হলে রাষ্ট্রের রথ অচল হয়ে পড়বে। ব্যঞ্জনা এই যে—অতএব এদের উন্নয়ন এবং শিক্ষিত বিত্তবান সমাজের শামিল করে নেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়টি কবি সমাজনেতাদের প্রতি তাঁর শেষ অনুরোধেও একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন, যার কথা একটু পরেই বলছি। কিন্তু রক্তকরবী ও কালের যাত্রা পড়ার পর রবীন্দ্র-রচনার পাঠকের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে এই রবীন্দ্রনাথ 'অন্য রবীন্দ্রনাথ' নন, একই রবীন্দ্রনাথ, ক্রমশ অনুভূতি ও উপলব্ধির পরিণামে এসেছেন।

কবির লেখচিত্রের এই দ্বিতীয়ার্ধে, মানবমুখ্যতার অংশে কাব্য-কবিতার রীতিবদল ও সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর বদলও লক্ষণীয়। 'পুনশ্চ' কাব্যে কবির এই বৈপ্লবিক পথ-পরিবর্তনের বিষয় অনেক পাঠকই জানেন। তাঁর অবলম্বিত নতুন বাহন গদ্যচ্ছন্দ তখনকার কাগজপত্রে কী বিতর্কেরই না সৃষ্টি করেছিল। তার উপর অতি নগণ্য মানবিক বিষয়ের পরিস্ফুটনে কবির আগ্রহ—নেড়িকুত্তার সহচর ইস্কুল-পালানো সেই দুরন্ত ছেলেটা, খোঁপায় ক্যামেলিয়া-গোঁজা সেই সাঁওতাল রমণী; কিন্তু গোয়ালার গলির পঁচিশ টাকা মাইনের কেরানী, আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু, ছেঁড়া ছাতি মাথায়! দ্বিতীয় পালাবদলের হাওয়ায় কবির যেন হাড়েমাসে রূপান্তর ঘটল, কবি যেন স্বপ্নচারিতায় আর পরিতুষ্ট থাকতেই চাইলেন না। 'পুনশ্চ'র অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কয়েকটি কবিতা এবং একই সঙ্গে চণ্ডালিকা ও তাসের দেশ নাট্যগ্রন্থনও লক্ষণীয়। 'তাসের দেশ' পূর্বোক্ত অচলায়তনেরই সূক্ষ্ম প্রতিরূপ, দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের উপর আরও পরিশীলিত ব্যঙ্গে দীপ্তিমান। আর এই নাট্যে সংযোজিত সমাপ্তি-সংগীতের একটি বাণী চিরকালের মত অক্ষয় হয়ে কবির বিপ্লবী মহিমা কীর্তন করছে—জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্। কবি এই সময়ে শ্রীনিকেতনে অবহেলিত মানুষের উন্নয়নের কাজে নিমগ্ন, উত্তুঙ্গ ভাবস্বপ্নের বিকার সযত্নে পরিহার করারই প্রয়াস করছেন।

শ্রীনিকেতনীয় মানুষ-উন্নয়ন প্রসঙ্গে তাঁর 'পল্লীপ্রকৃতি' পুস্তিকায় নিবন্ধ ভাষণাবলী মিলিয়ে নেওয়া কর্তব্য। এ বিষয়টি বুঝে দেখতে হবে যে তাঁর কাব্যগত মানব-অনুরাগ ছন্দোবিলাসবিভ্রম মাত্র ছিল না, তার ভিত্তি কার্যকরী, সুদৃঢ় ও সামগ্রিক আত্মনিয়োগে। চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা ও কর্মের এহেন সামঞ্জস্য দুর্লভ। সমবায়ের ভাষণগুলিতে স্বদেশের সামাজিক ও আর্থিক অসামঞ্জস্যের নিরাকরণ হিসেবে, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের কতকটা বিকল্প হিসেবে কবি বহু পূর্ব থেকেই সমবায় ব্যবস্থার প্রয়োগ বিহিত করে এসেছেন। আর পল্লীবিষয়ক ভাষণাবলীতেও সংগঠনের পথ দেখিয়েছেন—যে গঠনমূলক স্বাদেশিকতার বিষয়ে তিনি শিলাইদহ-কালিগ্রামে বহুপূর্বেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ-বিপ্লবের বাণী গদ্য রচনাগুলিতে তেমন ব্যক্ত করেন নি, যেমন করেছেন কাব্যে নাট্যে সংগীতে—'বাঁধ ভেঙে দাও—'প্রভৃতি যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাই হোক, এও দেখতে হবে যে আমাদের স্বদেশের মানবিক সমস্যা পশ্চিমের দেশগুলি থেকে ভিন্ন, বরং জটিলতর, কারণ আধুনিক ধনতান্ত্রিক শোষণের বহুপূর্ব থেকেই জাতিবর্ণ বিভাগময় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এর মজ্জার মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। কবির মানুষপ্রীতি কত আন্তরিক ও গভীর এবং আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কেও কবি কী পরিমাণ ওয়াকিবহাল, এমনকি খ্যাতনামা স্বাদেশিকদেরও অগ্রবর্তী তার পরিচয় রয়েছে এইসব প্রাসঙ্গিক ভাষণে। মাটি ও মাটি-সংলগ্ন নীচের তলার মানুষগুলির উপর তাঁর কী গভীর অনুরাগ! 'পল্লীপ্রকৃতির' এক জায়গায় তিনি বলছেন—

> "মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটোলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকলপ্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছুই দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল। অথচ দেশের অধিকাংশই তারা।"

'উপেক্ষিতা পল্লী' কবির একটি বিশিষ্ট ভাষণ। এর মধ্যে তিনি আধুনিক বিশ্বের শ্রেণী-পার্থক্যের বিবরণ দিয়েছেন—

> "বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন-উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তিনিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর-এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে। চাঁদের যেমন একপিঠে অন্ধকার, অন্যপিঠে আলো, এ সেই রকম।"

পরে স্বদেশে এই অমানবিক ব্যবধানের জটিলতর গঠন বিশ্লেষণ করে শিক্ষিত শোষকদের অবহিত করতে গিয়ে ভাবী বিপ্লবের আভাস সূচনা করে বলছেন—

> "একধারেই সব কিছু থাকে, আর এক-ধারে কোনো কিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়।......এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে, তারা

সর্বসাধারণকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে—কেননা, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে।"

এর কিছু পূর্বে কবি কারো কারো অনুরোধ উপেক্ষা করেই রাশিয়া পরিভ্রমণ করে এসেছেন, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের দেশ-উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ লক্ষ্য করেছেন, আর স্বদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বার্থময় ঔদাসীন্য অনুভব করে বিলাপ করেছেন—কী হয়নি, আর কী হতে পারত! 'রাশিয়ার চিঠি'র বিষয় সকলেরই জানা। এ নিয়ে কালক্ষেপ কর্তব্য হবে না। আমরা তাঁর একান্ত প্রগতিমুখী চিন্তাভাবনার ও কার্য-কলাপের সঙ্গে একালকার এবং একেবারে শেষ দিককার কবিতার সম্বন্ধ দেখিয়ে উপসংহারে আসছি।

কাব্যগ্রন্থের নাম 'পুনশ্চ'। কবিতার নাম—প্রথম পূজা। আমরা দেখেও দেখিনি, অথচ কবি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে মধ্যযুগে রাজা-জমিদারেরা যেসব উৎসব অনুষ্ঠান করে জনচিত্ত তৃপ্ত ও বশীভূত রাখতেন, এই সেদিনও যার রেশ ছিল এবং আজ যা বারোয়ারিতে পরিণত হয়েছে, সে-সব ঠাকুর-দেবতা অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণ বা অনার্যদের কাছ থেকে দখল-করা, কেড়ে নিয়ে আসা। এরকম রাজন্য-প্রতিষ্ঠিত একটি দেবতার মন্দির বা 'রাজদম্ভের মন্দির' একদিন ভাঙল ভূমি-কম্পে, সারাবার জন্য নিরুপায় হয়ে রাজাকে ডাক দিতে হল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কারিগর কিরাতবৃদ্ধকে, পূর্বে যার সম্প্রদায়ের প্রাণের ঠাকুর ছিল এই দেবতা। রাজ্যের নিয়ম অনুসারে অন্ত্যজ কিরাতের দেবতার দিকে তাকানো নিষেধ, তাই তার চোখ বেঁধে দেওয়া হল। মন্দির সারাবার কাজ যখন সমাপ্ত তখন বৃদ্ধ কারিগর আর থাকতে পারলে না, চোখের বাঁধন খুলে আকণ্ঠ পান করতে লাগল নিজের দেবতার রূপকে। খবর গেল। রাজা এসে স্বহস্তে তার শিরশ্ছেদ করলেন। গদ্যচ্ছন্দে লেখা, কবির এটি একটি উৎকৃষ্ট কবিতা, ভাবে ভাষায়, বৈপ্লবিক ব্যঞ্জনায়।

কাব্যগ্রন্থ 'পত্রপুট', কবিতাটি কবির আত্মচরিত্র বর্ণন বিষয়ে। এতে কবি উদাত্তভাবে শ্রেণীজাতির বিভাগমুক্ত বাউলের সঙ্গে নিজের সগোত্রতা-সম্পর্ক বুঝিয়ে দিয়েছেন—

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।......
কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।

এবং একটা আদর্শের পথিক হিসাবে তিনি যে-সত্তার পূজারী তাকে অন্তরতম মানুষ আখ্যা দিয়ে অনুনয় করেছেন—

হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।

পত্রপুটের 'আফ্রিকা' কবিতা এই নিপীড়িত মানবধর্মেই রচিত। তবে লক্ষণীয় এই যে, রাষ্ট্রনেতা ও শাসক বাদ দিয়ে য়ুরোপের জনসাধা-রণের উপরে কবির যে সামান্য আস্থা ছিল তা স্তিমিত হয়ে গেছে। কবি দেখেছেন, ওপারে যখন বীভৎস হত্যালীলা চলেছে, তখন তাদের মন্দিরে বাজছে ঘণ্টা, তারা খৃস্টের কাছে জয়ের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে। পশ্চিমের সভ্য জীবনের উপর প্রচণ্ড ধিক্কার ও ঘৃণার কবিতা এটি।

শেষ জীবনে কবি তাঁর নিজ স্বরূপকে নিঃশেষে পরিচায়িত করতে ব্যগ্র হয়েছিলেন, কারণ, তিনি দেখেছিলেন তাঁকে কেবল নিসর্গ-প্রেমিক ও উপনিষদ্‌বাদী কবি বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই শেষবেলায় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে মানহারা ভাষাহারা কর্মী মানুষের সঙ্গে আত্মিক সৌহার্দ্য, অথচ বহিরঙ্গে বঞ্চিত থাকার বেদনার বিষয়ও কবিকে বারবার জানাতে হয়েছে—

সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

এই কবিতারই অনুপূরক হিসাবে মৃত্যুর মাসছয়েক আগে লেখা বিখ্যাত কবিতা হ'ল 'ঐকতান'—প্রায় সর্বজনপরিচিত। এই কবিতায় তিনি আরও স্পষ্টভাবে মেহনতী মানুষের সঙ্গে তাঁর নিকট অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভাবের কথা জানিয়ে ঐ মূঢ় মূক সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা কোনো কবির আগমন কামনা করেছেন। কবি তাঁর দৈন্য জানি-য়েছেন, আর সেকথাও ঠিক, কিন্তু অবহেলিত শোষিত মানুষকে প্রত্যক্ষ দেখে তাদের দুরবস্থার পরিচয় জেনে এত অশ্রুপাত, ক্ষতি-স্বীকার এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্‌যোগই বা আর কোন্ সাহিত্যিক করেছেন?

কবির প্রয়াণের বৎসরে লেখা মানবিক-অধিকার-শূন্য মানুষের সপক্ষতা বিষয়ে আরও অন্তত দুটি কবিতা স্মরণীয়। প্রথমটি রয়েছে 'আরোগ্য' কাব্যে দ্বিতীয়টি পরবর্তী কাব্য 'জন্মদিনের' মধ্যে, এসব উক্ত 'ঐকতান' কবিতারই কাছাকাছি সময়ে লেখা। এর প্রথমটিতে (ওরা কাজ করে) কবি রাষ্ট্রিক প্রতাপ, জটিল শাসন-ব্যবস্থা ও শাসক ব্যক্তিদের ক্ষণস্থায়ী ও মূল্যহীন মনে করেছেন। অপরপক্ষে, অভি-নন্দিত করেছেন মেহনতী সাধারণ মানুষকে, চিরকালের সত্য মানুষ বলে। কারণ, এরাই মানুষের বাঁচার আয়োজন ও সভ্যতার ভিত তৈরি করে সৃষ্টিকে সার্থক করে চলেছে চিরকাল। সাধারণ মানুষের মমত্বে উদ্‌বোধিত হয়ে লেখা কবির শেষ কবিতা হল—'সিংহাসনতল-চ্ছায়ে—'। বর্ণনায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের কী বিগলিত করুণা, কী অপরিসীম স্নেহ! অথচ কবিতাটি রাষ্ট্রনেতাদের ও সমাজশাসকদের প্রতি অনুজ্ঞাবাহীও বটে। ইংরেজ শাসনের অবসরে লেখা হলেও এটি কালোত্তীর্ণতার মহিমাও বহন করছে। শোষিত মানুষের বাস্তব চিত্র নিরলংকার স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করে কবি রাষ্ট্র-সমাজ-নেতাদের সাবধান করে দিয়েছেন, মানুষে-মানুষে নিদারুণ পার্থক্যের অবসান না ঘটালে রাজত্ব বিপ্লবের আঘাতে বিচূর্ণ হবে—

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।......
মহাঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত—
সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়। ইত্যাদি

নিত্য এই দাহ অন্তরে বহন ক'র কবি যে শান্তিতে প্রয়াণ করেন নি এ আমরা জানি।



শান্তিদেব ঘোষ

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্য-গীতকে সম্মানজনক শিক্ষণীয় বিদ্যা হিসেবে স্থান দিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবী বাঙালি সমাজের জন্য ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নতুন একপ্রকার নৃত্যআন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন। এ নাচের সৃষ্টি হয়েছিল গুরুদেব রচিত নানাপ্রকার নাটকের গানকে নির্ভর করে। গানের ভাবকে নৃত্যভঙ্গিতে অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশের চেষ্টা থেকেই, ভারত ও বিদেশী নানাপ্রকার ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যের সমন্বয়ে রচিত মিশ্রপদ্ধতির একপ্রকার নাচের উদ্ভব এখানে হয়। যে সব অঞ্চলের লোকনৃত্য এই আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল, তারমধ্যে গুজরাত, কাথিওবার, মণিপুর, নাগা, কেরল, এবং বিদেশের মধ্যে হাঙ্গেরী, রাশিয়া ও শ্রীলংকার নাম করা যেতে পারে। এর সঙ্গে, বাংলার বাউল ও রাইবিশে নাচের যে কতখানি স্থান ছিল আজকে আমি বিশেষ করে তারই কথা প্রথমে বলতে চেষ্টা করছি।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক বছর পর শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবা-বিভাগ গ্রামোন্নয়নের নানা প্রকল্পের মধ্যে নিকটবর্তী গ্রামের মেলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। একাজের জন্য শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন থেকে একদল ছাত্র ও কর্মীকে স্বেচ্ছাসেবকরূপে নিয়ে আমার পিতৃদেব কালীমোহন ঘোষ প্রথম গিয়েছিলেন ১৯২৪ খৃস্টাব্দে পৌষ-সংক্রান্তির সময় বীরভূমের বিখ্যাত জয়দেব-কেন্দুলীর মেলায়। আমাদের থাকবার ব্যবস্থার জন্য একসারি তাঁবু ফেলা হয়েছিল মেলার প্রাচীন বটগাছের তলায় যেখানে বাউল নরনারীরা দলে দলে থাকতেন, তার গায়ে লাগা পশ্চিমের খোলা মাঠে নদীর পারে। পাশাপাশি থাকার দরুন, বাংলার নানা জেলার বাউলদের সঙ্গে মেশবার এবং তাঁদের গানশোনা ও নাচ দেখবার সুবিধা পেয়েছিলাম, খুবই সহজে। সে যুগের মেলার এই বাউলসমাবেশে, সকালে বিশাল বটগাছের ডাল-পালা ভেদ-করা সূর্যের আলোয় আলোকিত অঙ্গনে এবং সন্ধ্যায় কাঠের আগুনে ও কেরসিনের বাতির আলোর চারিপাশে ছোট ছোট আখড়ায় সমবেত বাউল নরনারীদের কণ্ঠের গান, একতারার ঝংকার, মন্দিরা বাঁয়া ও খঞ্জনীর তালের বোল এবং পুরুষদের বৈচিত্র্যময় পদ-ছন্দে উত্থিত কাঁসার নূপুরের ধ্বনি ও বাঁশীর সুরে চারিদিক মুখরিত হয়ে থাকত। এখনকার মত বিজলির সুবিধায় মাইক ও লাউডস্পিকারের সাহায্যে যেরূপ কোলাহলময় শব্দতরঙ্গের দৌরাত্ম্য ঘটে, তখন তা ঘটত না।

সে-যুগে প্রতি আখড়ায় বাউলরা যখন পূর্বাহ্ন এবং অপরাহ্নে

একজনের পর একজন নাচ ও গানে আনন্দ করতেন তখন আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এইভাবে বাংলার বাউলদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৯৩১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের নাচ ও গানের টানে আরো কয়েকবার সেখানে গেছি। প্রতিবারেই কয়েকজন খুবই উঁচু দরের নৃত্যকুশলী বাউলকে পেয়েছি। সে-যুগের 'গোপাল ক্ষেপা'র কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। তিনি আমাদের আগ্রহে ৭ পৌষের উৎসব-মেলায় প্রায়ই আসতেন। শেষদিকে পেয়েছিলাম পূর্ণ দাসের পিতা নবনী দাসকে। তিনি ছিলেন আমার বন্ধুর মত। আমার আগ্রহে তিনি প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আসতেন এবং নাচে ও গানে সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। প্রতিবারই জয়দেব-কেন্দুলীর মেলা থেকে শান্তি-নিকেতনে ফিরে গুরুদেবের গানের সঙ্গে বাউলদের মত নাচের অনুকরণ করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা প্রকাশ্যে নয়, অতি গোপনে।

তখনকার দিনে, শান্তিনিকেতনে দোলের সময় সকালের অনুষ্ঠান এ যুগের মত আনুষ্ঠানিক ভাবে হত না। আম্রকুঞ্জে বা অন্যত্র, অধ্যাপকগণ ও ছাত্রছাত্রী দল, একসঙ্গে বসে আপন আনন্দে গুরুদেব রচিত যাবতীয় বসন্ত ঋতুর গান সমবেত কণ্ঠে গাইতেন। রঙখেলাও চলত তার সঙ্গে। ১৯৩১-এর দোলের দিনে সকালের এইরূপ গানের আসর বসেছিল শালবীথির দক্ষিণে ও সন্তোষালয়ের উত্তর-পশ্চিমে, পুরোনো একটা ভাঙা বাড়ির সিমেন্টের উন্মুক্ত চাতালে। সে দিনের সেই আসর যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন আমি নিজে থেকেই উঠে দাঁড়ালাম গানের সঙ্গে নাচবার প্রবল উৎসাহে। গাছের একটি ডাল ভেঙে নিয়ে ডান হাতে বাউলদের একতারার মত সেটিকে ধরে নাচতে শুরু করলাম। তা দেখে কলাভবনের একটি ছাত্রও আমার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছামত নাচতে শুরু করলেন। সঙ্গীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য নন্দলাল ও অন্যান্যরা আমাদের ক্রমান্বয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন। শিল্পাচার্য নিজে একটি পাতলা চাদর আমার কোমরে খুবই আঁট করে বেঁধে দিলেন। সকলের কাছ থেকে এভাবে উৎসাহ পেয়ে, প্রবল আনন্দে একটার পর একটা গানের সঙ্গে আমরা একটানা নেচেছিলাম, প্রায় দু ঘণ্টা। একটুও ক্লান্তি বোধ করিনি। বাউলদের নাচের ঢংকে গুরুদেবের নানা ছন্দের বসন্ত ঋতুর গানের সঙ্গে মিলিয়ে কীভাবে যে সেদিন নেচেছিলাম, তা জানিনা। কিন্তু গুরুদেবের গানের বিভিন্ন ছন্দে নাচতে গিয়ে কোনবার যে ছন্দপাত করিনি সেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম ভাল করেই। গুরুদেবের কানে আমার নাচের সংবাদ পৌঁছনো মাত্রই, অপরাহ্নে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, "নবীন"-এর অনুষ্ঠানেও আমাকে নাচতে হবে। সেদিন যে গানটি তিনি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন সেটি ছিল, "ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়"। এইভাবে, প্রকাশ্যে আমার নৃত্যজীবনের প্রথম সূত্রপাত ১৯৩১-এর দোলের সকাল ও সন্ধ্যার আনন্দানুষ্ঠানে। জয়দেব-কেন্দুলীর বাউলদের মত অত নিখুঁত ছন্দে নাচতে পারিনি সেদিন, কিন্তু তাঁদের নাচের প্রেরণা যে ছিল আমার নাচের মূল উৎস একথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি।

"নবীন"-এর অনুষ্ঠানে আমার নাচ দেখে গুরুদেব খুবই খুশি হলেন। স্থির করলেন কলকাতায় রঙ্গমঞ্চে 'নবীন'-এর পরবর্তী অনুষ্ঠানেও আমার নাচ থাকবে। একক, দ্বৈত ও সমবেত নৃত্যের জন্য মোট তিনটি গান আমাদের জন্য তিনি বেছে দিয়েছিলেন।

প্রবল উৎসাহে "নবীন"-এর মহড়ার কাজ যখন চলছে তখন খবর এল, বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী নৃত্যআন্দোলনের উদ্বোধনের জন্য বাংলার কতগুলি জেলার লোকনৃত্যগীতের শিল্পীদের সংগ্রহ করে একটি অনুষ্ঠান করছেন, সিউড়ীতে। দেখবার জন্য তিনি নিমন্ত্রণও জানিয়েছেন। গুরুদেব আমাদের সিউড়ীতে পাঠালেন। সেই অনুষ্ঠানেই আমরা বীরভূমের রাইবিশে এবং বাংলাদেশের মৈমনসিংহ অঞ্চলের মুসলমান যুবকদের রুমাল হাতে জারী-গানের সঙ্গে দলবদ্ধ নাচ, প্রথম দেখি। এদুটি নাচই আমাদের ভাল লেগেছিল। সিউড়ী থেকে ফিরে, গুরুদেবের কাছে আবেদন করলাম, গুরুসদয় দত্তকে বলে রাইবিশে নর্তক আনিয়ে দিতে; সেই নাচ শিখে "নবীন"-এর নাচ তৈরি করব। গুরুদেব উৎসাহ দিলেন শেখবার জন্য এবং গুরুসদয় দত্তকে খবর দিয়ে নাচিয়েদের আনালেন। তাঁদের কাছে আমরা দিন সাতেক কিছু নৃত্যভঙ্গি শিখে, বাউল নাচের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে "নবীন"-এর গান কটির সঙ্গে নতুন করে নাচ তৈরি করেছিলাম। কলকাতায় নাচের সময় প্রচলিত একতারার অভাবে আমাদের জন্য পশ্চিম ভারতীয় একতারা কিনে দেওয়া হল কলকাতার যন্ত্রের দোকান থেকে। গুরুদেবের গানের সঙ্গে এভাবে নতুন নাচ তৈরি করবার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী জীবনে বহু নাচ তৈরি করেছি, অন্যদের তা শিখিয়েছি এবং নিজেও নেচেছি। বাউল নাচকে ভিত্তি করে এভাবে পরবর্তী যুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে অন্য নাচের নানাপ্রকার পদছন্দও মিশিয়েছি, কিন্তু তার জন্য বাউল নাচকে তার মূল প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দিইনি। এইরূপ মিশ্রিত বাউলনাচ রচনার সময় গুরুদেবের নির্দেশ আমাকে খুবই সাহায্য করেছিল। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বাউল নাচের মূল চরিত্রটিকে ঠিক রেখে কিভাবে মিশ্রণ সম্ভব। যে কাজ তিনি নিজে করেছিলেন "ফাল্গুনী" নাটকের অন্ধ বাউলের চরিত্রে গানের সঙ্গে নাচের সময়।

১৯২৪ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত বাউলদের যে নাচ দেখেছি এবং পরবর্তী যুগে "নবনী দাস" যেভাবে গান গেয়ে নাচতেন, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

সে যুগের বাউলরা যখন নাচতেন তখন তাঁরা পুরুষোচিত নানা-প্রকার বলিষ্ঠ পদছন্দ প্রকাশ করতেন গানের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে। এছাড়া গানের মাঝে মাঝে বাঁয়া ও মন্দিরার ছন্দও পায়ে তুলতেন এবং তালের সমে এসে তালের নাচ শেষ করে পুনরায় গান ধরতেন। তাঁদের নাচে ছিল পুরুষোচিত প্রচণ্ড ছন্দবেগ যা এ যুগের কোনো বাউলদের মধ্যে আর দেখা যায় না। এ নাচ রীতিবদ্ধ নৃত্যাভিনয় নয়। গানের ভাবকে হাতের ভঙ্গিতে অভিনয়ে প্রকাশ করবার সুযোগ এ নাচে ছিল না। কারণ, এঁদের দুই হাত যুক্ত থাকত একতারা ও বাঁয়ার সঙ্গে। দেহের ও পায়ের নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেভাবে বাউলরা ডান হাতে একতারাকে পরিচালনা করতেন, তার পিছনে যে সুনির্দিষ্ট ছন্দবোধ কাজ করছে তা বোঝা যেত। হাতের একতারাটির বিচিত্র বিন্যাস দেখে মনে হত, যেন যন্ত্রটি সমগ্র দেহের সঙ্গে আপনা থেকেই নেচে চলেছে। যদিও গানের সুরের সুবিধার্থে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হত, কিন্তু বাউলরা সেটিকে তাঁদের নৃত্যভঙ্গিরই একটি বিশেষ অঙ্গ করে নিতে পেরেছিলেন।

তাঁরা যখন গান গাইতেন নাচের সঙ্গে, তখন তাঁদের মুখ ও চোখ দেখে মনে হত, যেন তাঁরা গানের ভাষায় তাঁদের বক্তব্য শোনাচ্ছেন। চারিদিকে উপবিষ্ট সঙ্গীদের দিকে ঘুরে ফিরে, চোখে চোখে তাকিয়ে, আনন্দোজ্জ্বল হাসিমুখে যেন বোঝাতে চাইতেন তাঁরা কি বলতে চান। তাঁদের তখনকার নৃত্যমুখর দেহভঙ্গি এবং চোখ ও মুখের ভাবে প্রকাশ পেত গভীর প্রেমানন্দে মগ্ন প্রেমিকের মনের একটি উদ্দাম আনন্দের আবেগ।

বাউলদের গানের সঙ্গে নৃত্যছন্দে অভিনয়ের এই পদ্ধতিটিকে আমরা গুরুদেবের নানা প্রকৃতির গানের সঙ্গে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলাম। ভারতীয় লোকনৃত্যগীতের প্রতি গুরুদেবের কিরূপ আগ্রহ ছিল ব্যক্তিগত একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করছি।

১৯৩১-এ কলকাতায় "নবীন"-এর গানের সঙ্গে নাচের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ভাল করে পুরুষদের নাচ শেখবার প্রবল ইচ্ছা আমার মনে জাগে। গুরুদেবের কাছে তা প্রকাশ করি। তিনি খুবই উৎসাহ দেন। পুরুষ লোকনৃত্যে বিষয়ে খোঁজখবর করে মে মাসের মাঝামাঝি আমি যাত্রা করি দক্ষিণ ভারত অভিমুখে। বিশ্বভারতীর একজন প্রাক্তন ছাত্রের সাহায্যে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত কেরলের কথাকলি নাচের বিদ্যালয়ে "কেরলা কলামন্ডলমের" প্রতিষ্ঠাতা ভালাথোল নারায়ণ মেনেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে কথাকলি নাচ শেখবার অনুমতি আমাকে দেন, সানন্দে।

এ ধরনের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ভ্রমণের সময় পরিচয় পত্রের যে প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে আমার খেয়াল ছিল না, যার জন্যে যাত্রার পূর্বে গুরুদেবের কাছ থেকে আমার পরিচয়পত্র নিতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কেরলে পৌঁছে, ভালাথোলের কথা, বিদ্যালয়ের কথা এবং আমার নাচ শেখবার বিস্তারিত বিবরণসহ আমার চিঠি পাবার কদিন পরেই তিনি নিজে থেকেই আমার একটি পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেটি পাবার পর আমার খেয়াল হয়েছিল যে, এইরূপ একটি পত্র আমার যাত্রার পূর্বেই সংগ্রহ করা উচিত ছিল। আমার ভুলো মনের কথা চিন্তা করে গুরুদেব নিজে থেকেই পরিচয়পত্রটি পাঠানোয় আমি সত্যিই অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। চিঠিটিতে তিনি বিশেষ করে এক জায়গায় লিখেছিলেনঃ—

"He intended to travel in various parts of India studying different kinds of indigenous dancing and collecting folk tunes."

সঠিক খবর না নিয়ে, নাচ শেখবার উৎসাহে শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে পড়ে আকস্মিকভাবে আমি কথাকলির সন্ধান পাই। কিন্তু, আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকনৃত্যের চর্চা। লোকসঙ্গীতের চর্চার বিষয়ে তখনো পর্যন্ত আমি কিছুই ভাবিনি এবং এ নিয়ে গুরুদেবকে আমি কিছু বলিও নি। তবুও, পরিচয়পত্রের ঐ দুটি পংক্তি পড়বার পর আমার মনে হয়েছিল, গুরুদেব যেন চাইছেন, লোকসঙ্গীতের প্রতিও আমি মন দিই। তখন থেকে তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকরী করবার প্রতি মনে আগ্রহ দেখা দেয়। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবার পর বীরভূমের এবং অবিভক্ত বাংলার লোকসঙ্গীত সংগ্রহের কাজ শুরু করি, আমার অন্যান্য কাজের সঙ্গে। ধীরে ধীরে একাজ চলতে থাকে। অনেকখানি যখন এগিয়েছি, তখন বুঝতে পারলাম যে, বাংলার লোকসঙ্গীত গুরুদেবের গানে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। গুরুদেব নিজে বাংলার বাউলদের গানের প্রভাবের কথা লিখিতভাবে উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু নিজে বিশ্লেষণের দ্বারা তা বুঝিয়ে না বলায়, আমাদেরই তার কথা ভাবতে হয়েছিল। এ গানের সংগ্রহের পর দেখা গেল যে, তিনি লোকসঙ্গীতের সুর, ছন্দ ও ভাবের কেবল অনুকরণ করেন নি, তার সাহায্যে এমন সব নতুন ধরনের বিচিত্র পর্যায়ের গান রচনা করে গেছেন যা বাংলার লোকসঙ্গীতে কোনদিন ছিল না। বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রভাব গুরুদেবের গানে কিরূপে প্রতিফলিত হয়েছে, এবার সংক্ষেপে তার আলোচনা করছি।

বাংলার লোকসঙ্গীতের সহজ সরল মনমাতানো রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, গুরুদেব তার সুর ও ছন্দের অনুকরণে, প্রথম দিকে বেশ কিছু গান রচনা করেছিলেন। এই গানগুলিকে পুরোপুরি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি বলা চলে না। কারণ, এর সুর ও ছন্দ তিনি গ্রহণ করেছিলেন গত শতাব্দীর নানাপ্রকার লোকসঙ্গীত থেকে। এর কথাগুলি ছিল কেবল গুরুদেবের। এইরূপে গান রচনা করে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নিজের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন ধারার গানের সুর ও ছন্দের মিলন ঘটাতে। সেদিক থেকে অনুকরণজাত এই গানগুলি যে কোন শ্রেষ্ঠ পল্লীগানের পাশে স্থান পেতে পারে। এই গানগুলির দ্বারা তিনি যেন নিজেকে পরীক্ষা করেছিলেন। এইরূপ গানের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ হলঃ

১) তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ
২) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
৩) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
৪) আমার সোনার বাংলা।

লোকসঙ্গীতের প্রচলিত এই রচনা রীতির মধ্যে গুরুদেব নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। তিনি পরিবর্তন আনলেন, কিন্তু কিভাবে তা আনলেন, এবারে তা বলি।

ভারতের লোকসঙ্গীতগুলি সুরের দিক থেকে ধ্রুপদের মত চার কলির গান নয়, এ হল দু-কলির গান। এই রীতিটির পরিবর্তন করে গুরুদেব তাঁর ঐ সুরের গানকে চার কলিতে সাজিয়ে তৃতীয় বা সঞ্চারী কলিতে, প্রথম দুকলির সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভিন্ন সুর যোজনা করতে লাগলেন। তৃতীয় কলিতে সুর যোজনার সময় লোকসঙ্গীতের সঙ্গে হিন্দীগানের রাগরাগিণীকেও স্থান দিলেন। কিন্তু, গানগুলি শোনার পর পরিষ্কার বোঝা যায় যে মূল সুরের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য নেই। রাগরাগিণী গুলিও যেন লোকসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে সহজে মিশে গেছে। লোকসঙ্গীতের সাহায্যে রচিত এইরূপ চার কলির কয়েকটি গানের উদাহরণ উদ্ধৃত করছিঃ

১) ঐ আসন তলের মাটির পরে
২) বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা
৩) এ বেলা ডাক পড়েছে।

বাংলার লোকসঙ্গীতের সুর ও ছন্দের সাহায্যে প্রকৃত সৃষ্টিমূলক যে সব গান গুরুদেব রচনা করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১) এই তো ভালো লেগেছিল
২) কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।

প্রথমটি, অন্যান্য চারকলির গানের মত ছোট আকারের গান নয়। গানটি মূলত মোট চারকলিতে বিভক্ত হলেও এর প্রতি কলিতে আছে মোট পাঁচটি পংক্তি। সবসমেত গানটি মোট কুড়ি পংক্তিতে রচিত। নানাপ্রকার দেশী সুরের সমন্বয়ে গানটি রচিত হয়েছে। দেশী গানের দুইকলি, কিংবা ধ্রুপদের মত চারকলির রীতিতে এ গানে সুর বসান নি। গানটির প্রতি পংক্তির অনুযায়ী সুরগুলি অতি সহজে জলের ধারার মত আপন আবেগে বয়ে চলেছে। সুরের বৈচিত্র্য বোঝা যায় কিন্তু তার জন্য গুরুদেবকে রাগরাগিণীর সাহায্য নিতে হয়নি, লোকসঙ্গীতের সুরের দ্বারাই এত বড় গানের পংক্তিকে সাজিয়েছেন।

'কৃষ্ণকলি' গানটি লোকসঙ্গীতের সুর ও রাগিণী মিশ্রিত গুরুদেবের আর একটি উল্লেখযোগ্য সার্থক রচনা। এটি হল, মোট পাঁচকলির আখ্যানমূলক লিরিক আবেগের, দেশী ও রাগসঙ্গীতের সুরে মিশ্রিত, গল্পবলার ছন্দে অভিনয়ের রীতিতে, আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা গেয়ে শোনাবার গান।

এ ধরনের এইরূপ দুটি কবিতায় সুর যোজনার এই রীতি ভারতের আর কোন প্রকার লোকসঙ্গীতে প্রচলিত নেই। এ যুগের আর কোন গীতরচয়িতা এ ধরনের গান রচনা করেছেন বলে শোনাও যায়না।

এই গান দুটির সুর যোজনার রীতি যেমন আধুনিকতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, তেমনি দেশের সঙ্গীতের বিশাল ও মূল্যবান সম্পদকে নির্ভর করে কিভাবে আমরা নতুন যুগের উপযোগী গান সৃষ্টি করতে পারি, তারও নির্দেশ এতে আমরা পাই।

(৯৫৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

লেখকদের প্রতি মনোভাবে। সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ প্রতিপাদন করতে গিয়ে তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় বিচিত্রা মাসিকে প্রকাশিত তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'সাহিত্যধর্ম' এই প্রতিবাদের দলিল বহন করছে। তার পরেও ওই একই সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের নবত্ব' প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধের ভাবটিকে আরও বিস্তার করেন। দুটি প্রবন্ধেই তিনি তরুণ লেখকদের অমিতাচারের সমালোচনা করে তাঁদের ভর্ৎসনা করেছেন কিন্তু সেই ভর্ৎসনা, লক্ষ্য করার বিষয়, স্নেহ মিশ্রিত। স্নেহের ভিতর উদারতার ভাব ওতপ্রোত।

এই সাহিত্যের নবত্ব প্রবন্ধেই কবি নবীন লেখকদের বেআব্রুতার আস্ফালনকে তিরস্কার করেও সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে তাঁদের কারও কারও রচনায় শক্তিমত্তা আছে। লিখেছেন, "আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাইনি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বারম্বার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।" এর পর ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একটি পত্রে তিনি লেখেন, "যে সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেছে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য যেখানে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।" অন্যত্র নবীন লেখকদের "লালসার অসংযম ও দারিদ্র্যের আস্ফালন"কে নিন্দা করে প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে তাঁদের স্বীকার করে বললেন, "বাংলার নতুন বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিলেন এঁরাই।" তৎকালীন নবীন লেখকদের অগ্রগণ্য শৈলজানন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন "দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই।...তিনি সহজেই ঠিক কথা বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলার কারিপাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।" কারি-পাউডারি ভঙ্গি অর্থাৎ নকল ভঙ্গি।

এসব উদ্ধৃতি সংকলিত করবার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য। তা হল, দেখানো যে, কবি অপ-সংস্কৃতির অলজ্জতা ও নকলনবিশীর ঘোরতর বৈরী হলেও ক্ষমাহীন ধিক্কারের পথে তিনি তরুণ লেখকদের স্বীয় স্নেহচ্ছায়া থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাননি, তাঁদের শক্তির বিকাশের সম্ভাব্যতায় তাঁদের জন্য যথেষ্ট প্রশ্রয় নিজের মধ্যে ধরে রেখেছিলেন। সহজাত উদারতা ও দাক্ষিণ্য-বুদ্ধির জন্যই তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। এটা অন্যায়ের সমর্থন নয়, অন্যায়ের নিরাকরণের রাস্তা খুলে রাখার একটা উপায় মাত্র। দুর্বলতা নয়, পরন্তু পরম সহনশীলতায় ও বাৎসল্যে অনিষ্ট-সম্ভাবনার ধার ক্ষইয়ে দেওয়া। ভর্ৎসনার দ্বারা যা পারা যায় না, মমতার দ্বারা তা অনেক সময় নিষ্পন্ন করা যায়।

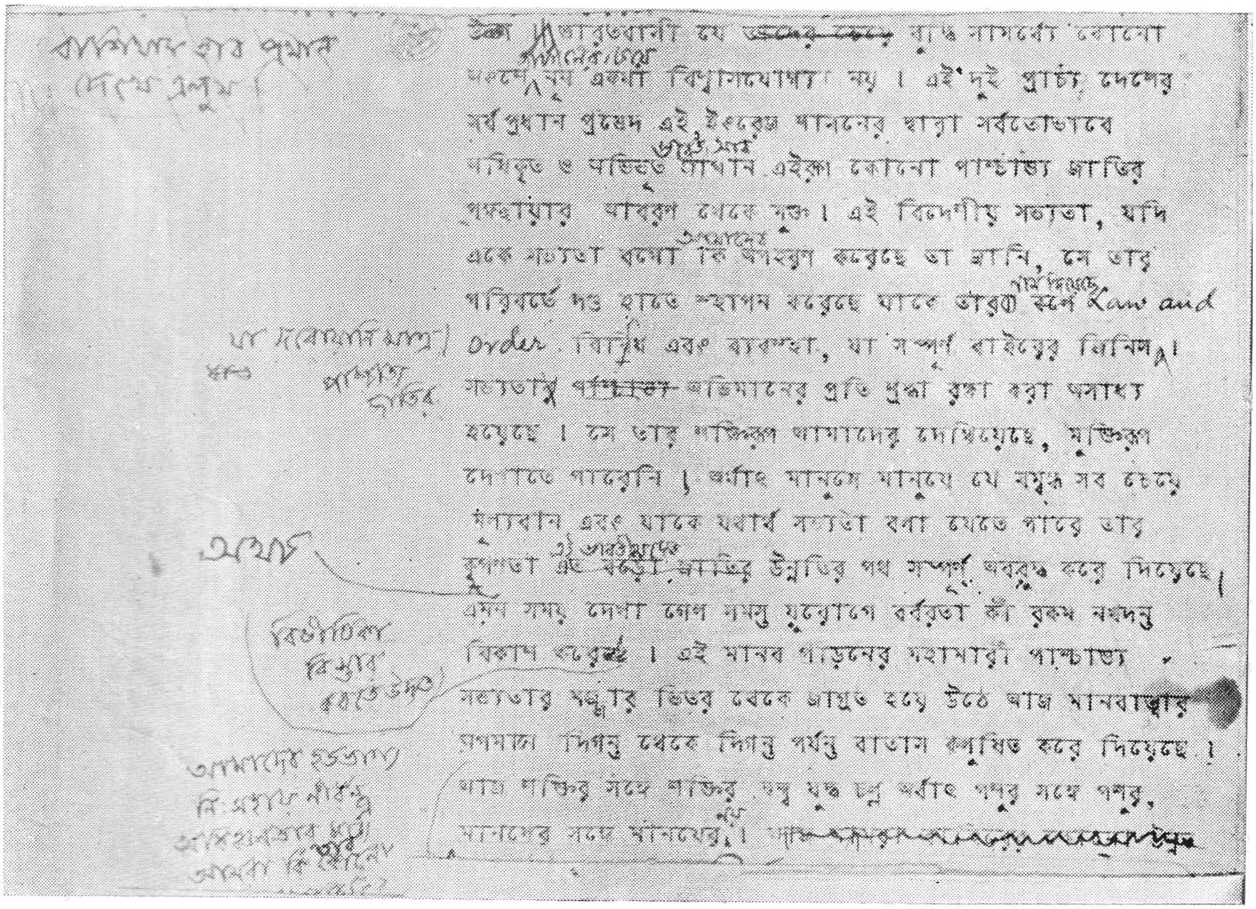
কবির পিতামহজনোচিত এই উদারতা পরিণামে ফলদায়ক হয়েছিল। কল্লোলের লেখকেরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে পরবর্তী কালে অপসংস্কৃতির রাস্তা পরিহার করেন এবং কবির উপদেশ শিরোধার্য করে সুস্থতার আদর্শকেই জীবনে বরণ করে নেন। অন্তত তাঁদের বেশীরভাগই যে এটা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ : মানুষের সপক্ষে

(৯৫৩ পৃষ্ঠার পর)

করেছিলেন সকলের সঙ্গে এক হবার, মিশে যেতে চেয়েছিলেন সেই অবহেলিত মানুষের সঙ্গে, যাঁরা যুগে যুগে ধর্মের নামে, দেশের নামে, আদর্শের নামে উঁচুতলার স্বার্থের বেদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ দিয়েছেন, যাঁদের পুরুষের মেহনৎ ও নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হওয়ার কোন ইতিহাস কোনদিন লিখিত হয়নি, সেই মানহীন মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন যিনি, এমন এক নতুন রবীন্দ্রনাথের আশিতে মৃত্যু হলেও, আমি বলব ত আকালমৃত্যু। পূর্ণ এক শতাব্দীর জীবনাধিকারে পৃথিবীতে তাঁর মত দাবি বোধহয় একালে আর কারো ছিল না, কারণ বিগত কালকে আগামী কালের সঙ্গে যুক্ত করে যথার্থ গন্তব্যের নির্দেশ দিতে পারতেন একমাত্র তিনিই আজকের বিভ্রান্ত নর-নারীকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও স্বদেশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৮এ ও বি লোয়ার রেঞ্জ, কলিকাতা-১৯ থেকে মুদ্রিত


ভারতবাসী যে বুদ্ধি সামর্থ্যে কোনো
অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্য দেশের
সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে
অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির
পক্ষচ্ছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি
একে সভ্যতা বলো আমাদের কি অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার
পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and
Order বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র।
পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা অসাধ্য
হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ
দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে
মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার
কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।
অথচ
এমন সময় দেখা গেল সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত
বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য
সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার
অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।
আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির, যন্ত্র যুক্ত দন্ত অর্থাৎ পশুর সঙ্গে পশুর,
মানবের সঙ্গে মানবের।

'সভ্যতার সংকট'-এর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

সেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম এ কালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল; সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠঅধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর